গণেশ পাইন চিত্রিত

মেটিয়াবুরুজের নবাব

শ্রীপান্থ

نواب واجد علیشاه

আঠারো শ’ ছাপ্পান্ন ।
লখনউ থেকে সদলবলে কলকাতায় এসে
নামলেন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি
শাহ । ইংরেজের চক্রান্তে তিনি রাজ্যহারা । ওরা
তাঁকে নির্বাসিত করেছে কলকাতায় । নবাবের
নতুন ঠিকানা কলকাতার মেটিয়াবুরুজ ।
আঠারো শ’ সাতান্ন । মহাবিদ্রোহ । লখনউয়ে
দাউ দাউ আগুন । মেটিয়াবুরুজ থেকে
ওয়াজিদ আলি শাহকে আটক করা হল ফোর্ট
উইলিয়ামে । ওয়াজিদ আলি শাহ ইতিহাসে
এক বিয়োগান্ত নাটকের দুঃখী নায়ক ।
কিন্তু চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, চরিত্রহননের
নিপুণ চেষ্টা, কোনও কিছুই হত্যা করতে পারেনি
ওয়াজিদ আলি শাহর সম্ভ্রান্ত, গর্বিত এবং
সংবেদনশীল উদার চরিত্রকে, তাঁর শিল্পী
মনকে । সুতরাং দেখতে দেখতে মেটিয়াবুরুজ
পরিণত দ্বিতীয় লখনউ-এ । সেই ইমারতের পর
ইমারত, সেই ইমামবাড়া মসজিদ, সেই
বাগবাগিচা, সেই চিড়িয়াখানা । লখনউর
মতোই গায়ক গায়িকা, নর্তক নর্তকী, কবি এবং
চিত্রশিল্পীর ভিড় মেটিয়াবুরুজে । কত্থক ।
ঠুমরি । গজল । সেই নুপূর নিক্বণ, সেই সুরেলা
কাব্য । ভাগীরথী তীরে সেদিন মৃদুমন্দ বইছে
গোমতী তীরের সুরভিত হাওয়া ।
উনিশ শতকের কলকাতার সেই বিবর্ণ এবং
বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কেই এ বইয়ের পাতায়
আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছেন
লেখক । তাঁর কলমের গুণে সম্পূর্ণত তথ্য
নির্ভর ঐতিহাসিক আখ্যান যেন পরিণত
রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসে । শুধু ওয়াজিদ আলি শাহ
নন, তাঁর সঙ্গে সহসা আবার প্রাণ ফিরে পেল
সেদিনের লখনউ, কলকাতা এবং
মেটিয়াবুরুজ । শুধু দরবারি বিলাস নয়,
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনতার ক্রোধের আগুনেও
উজ্জ্বল এখানে ধূসর অতীত । চোখের সামনে
জ্বলজ্বল করছেন অগ্নিপ্রতিমা বেগম হজরত
মহল । সেই অতীত আরও মুখর হয়ে উঠেছে
গণেশ পাইনের জাদুকরি তুলির স্পর্শে । কলম
আর তুলির এমন নিবিড় সম্পর্ক কদাচিৎ ঘটে ।

শ্রীপান্থ নামের আড়ালে যিনি, পেশায় তিনি সাংবাদিক। সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘকাল ধরেই মাঝে মাঝে তিনি পাঠকদের উপহার দিয়ে চলেছেন ইতিহাসাশ্রিত নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বই। শ্রীপান্থের চর্চার বিষয় আধুনিক ইতিহাস। অধুনা প্রধানত কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সহজ সাবলীল নির্ভার গদ্যে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের সঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব, শ্রীপান্থের রচনার বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতার জন্য শ্রীপান্থের রচনা যেমন একদিকে সাধারণ পাঠকের প্রিয়, অন্য দিকে তেমনই পেশাদার ঐতিহাসিকদের কাছেও মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণীয়। শ্রীপান্থের তথ্য সন্ধান, তথ্য বিন্যাস এবং সামাজিক ইতিহাস রচনায় নব নব উপকরণের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার দেখে সকলেই চমৎকৃত। 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' রচনায়ও সক্রিয় একই কুশলী গবেষক লেখক। উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাসে এমন একটি পর্ব তিনি তুলে ধরেছেন এ-বইয়ের পাতায় যা এতদিন ছিল আবছা অন্ধকারে মোড়া।

গণেশ পাইন সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পে তিনি আজ অগ্রণী পুরুষ। একান্তে আপন মনে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁর রহস্যময় স্বপ্ন জগৎ। সে-জগৎ ক্ষণে ক্ষণে বুঝি বা অতীন্দ্রিয়। সেখানে সতত চলেছে মৃত্যু আর জীবনের লড়াই। রূপকথার নায়কের মতো শিল্পীর এক হাতে যদি মরণকাঠি, অন্য হাতে তবে জিয়নকাঠি। সমূহ বর্তমানকে তিনি আলোআঁধারি মায়াজালে জড়িয়ে অবলীলায় যেমন স্তব্ধ করে রাখতে জানেন, আবার পিরামিডের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষায় পড়ে থাকা আসবাব আর অবয়ব তাঁর তুলির স্পর্শে সহসা প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়।

'মেটিয়াবুরুজের নবাব'-এর চিত্রাবলীতেও বাঙ্ময় একই দক্ষ রূপকার। পটের বিন্যাস, বিভাজন, প্রতিমা নির্মাণ, বর্ণলেপ, বুনোট এবং বক্তব্য— গণেশ পাইন এখানেও অনন্য। এমনকি রেখাচিত্রগুলিতেও স্পষ্ট তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষর। 'মেটিয়াবুরুজের নবাব'-এর চিত্রলহরি নিশ্চয় বন্দিত হবে বাংলা গ্রন্থসজ্জার ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান হিসাবে।

পুস্তক পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা
বিপুল গুহ, রতন সেন

মেটিয়াবুরুজের নবাব

গণেশ পাইন চিত্রিত

মেটিয়াবুরুজের নবাব

শ্রীপান্থ

আনন্দ
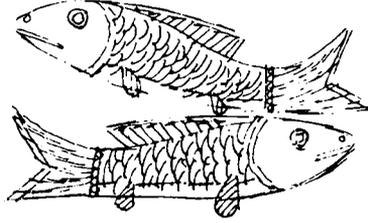
প্রথম সংস্করণ ২৪ আগস্ট ১৯৯০
অষ্টম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ গণেশ পাইন

পুস্তক পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা
বিপুল গুহ, রতন সেন

ISBN 978-81-7066-300-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

METIABURUJER NABAB
[Essay]
by
Sripantha

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৩০০.০০

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের
অন্যান্য বই

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক
কলকাতা
কেয়াবাৎ মেয়ে
ক্রীতদাস
পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া
বটতলা
মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ

ভূমিকা

কলকাতার ইতিহাস চর্চা করতে গিয়েই একদিন মুখোমুখি হয়েছিলাম অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের। জানা ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের ষড়যন্ত্রে ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর আপন রাজধানী লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর কলকাতা-জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। জানা ছিল না ইংরেজের দেওয়া মাসোহারা-নির্ভর রাজ্যহারা এই নবাব শহরের উপান্তে গড়ে তুলেছিলেন দ্বিতীয় এক লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌর সঙ্গে অবশ্য তুলনা চলে না তার, কিন্তু এখানেও সেই রাজকীয় জৌলুস আর বিলাস। প্রাসাদ, বাগবাগিচা, চিড়িয়াখানা। শুধু তাই নয়, মেটিয়াবুরুজের শিল্পগতপ্রাণ নবাবকে ঘিরে গায়ক-গায়িকা, নতর্ক-নর্তকী, কবি আর চিত্রকরদের ভিড়। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার বর্ণাঢ্য নগর-সংস্কৃতিতে নতুন রঙের ছোঁয়া, ভাগীরথী তীরে সহসা লক্ষ্ণৌর ফুরফুরে হাওয়া! অস্তমিত রাজতন্ত্রের বন্দনা নয়, লক্ষ্ণৌর সঙ্গে কলকাতার সেই সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার একটি রূপরেখা তুলে ধরতে গিয়েই এই রচনা। হাতে উপাদান ছিল যৎসামান্য, তাই কখনও মেটিয়াবুরুজ থেকে ছুটতে হয়েছে লক্ষ্ণৌ, কখনও লক্ষ্ণৌ থেকে মেটিয়াবুরুজ।

রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়, ১৯৮২ সনে। এবার নতুন করে আবার লেখা। ফলে শুধু আয়তনই অনেক বেড়ে যায়নি, যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন তথ্যও। তবে পাঠকের পক্ষে সত্যকারের প্রাপ্তিযোগ এবার বিখ্যাত শিল্পী গণেশ পাইনের আঁকা বারোটি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি এবং বেশ কয়েকটি রেখাচিত্র। লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি আড়াল করতে ইতিপূর্বে আর কোনও প্রথম সারির শিল্পী এভাবে এগিয়ে এসেছেন, জানি না। 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' গণেশ পাইনের মতো শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে, লেখকের কাছে সেটাই এক পুরস্কার। শিল্পীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিল্পী গণেশ পাইনের আঁকা এই মূল্যবান ছবিগুলো কীভাবে প্রকাশ করলে রূপরস অক্ষুণ্ণ থাকবে, গ্রন্থসৌষ্ঠবই বা কেমন করে উন্নত করা সম্ভব তা নিয়ে বিস্তর চিন্তা ভাবনা করেছেন একদিকে আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম শিল্পনির্দেশক বিপুল গুহ, অন্যদিকে আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড-এর তরফে বাদল বসু। তাঁদের উৎসাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

প্রচ্ছদের ছবিটি ওয়াজিদ আলি শাহের জীবৎকালে আউধের কোনও

শিল্পীর আঁকা। আপন সংগ্রহ থেকে সেটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন মণি রায়।

তরুণ সহকর্মী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় শুধু স্বেচ্ছায় পাণ্ডুলিপি সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বইটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আর দুই সহকর্মী অধীর বিশ্বাস ও কল্যাণ পণ্ডিত। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা
এপ্রিল, ১৯৯০

শ্রীপান্থ

অযোধ্যার নবাব বংশ
[শাসকবর্গ এবং তাঁদের রাজত্বকাল মোটা হরফে]
মির মহম্মদ নাসির
মির মহম্মদ আমিন
সাদত আলি খান, বুরহান-উল-মুলুক
১৭২২-১৭৩৯
কন্যা/স্বামী
জাফর বেগ খান
সদর উন্নিসা
সফদর জং
১৭৩৯-১৭৫৪
জালালউদ্দিন হায়দর সুজাউদ্দৌলা
১৭৫৪-১৭৭৫
আসফউদ্দৌলা
১৭৭৫-১৭৯৭
ওয়াজির আলি
১৭৯৭-১৭৯৮
(সিংহাসনচ্যুত)
সাদত আলি খান
১৭৯৮-১৮১৪
গাজিউদ্দিন হায়দর
১৮১৪-২৭
(প্রথম 'কিং' বা বাদশা)
নাসিরউদ্দিন হায়দর
১৮২৭-১৮৩৭
মুহম্মদ আলি শাহ
১৮৩৭-১৮৪২
মুন্না জান
(সিংহাসনে বসার ব্যর্থ চেষ্টা)
আমজাদ আলি শাহ
১৮৪২-১৮৪৭
মুস্তাফা আলি
ওয়াজিদ আলি শাহ
১৮৪৭-১৮৫৬
দারা সাতওয়াত
সুলেমান কদ্র
বিরজিস কদ্র
১৮৫৬-১৮৫৯
কমর কদ্র
আশমান ঝা
মেহের কাদের
(মৃত্যু ১৯৬১)
আনজুম কাদের
কাউকাব কাদের
নায়ের কাদের

"শহরে এক হুজুক উঠলো, 'লক্ষ্ণৌর বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করচেন, বিলেত যাবেন ; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোষাক, পায়ে আলতা', কেউ বল্লে, 'রোগা ছিপছিপে, দিব্যি দেখতে, ঠিক যেন একটা অপ্সরা।' কেউ বল্লে, 'আরে না, বাদ্‌সাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে।' কেউ বল্লে, 'আঃ—ওসব বাজে কথা, যেদিন বাদ্‌সা পার হন, সেই দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলেম ; বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, এক হারা, নাকে চশমা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।' লক্ষ্ণৌর বাদশা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় সহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো।"

এ-বিবরণ 'হুতোম প্যাঁচা'র। তাঁর 'নকশা'র প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬১ সন। দুই খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে। ঘটনা তার ক'বছর আগের। 'লক্ষ্ণৌর বাদসা' সদলবলে কলকাতা এসে পৌঁছন ৬ মে, ১৮৫৬। 'লক্ষ্ণৌর বাদসা' মানে অযোধ্যার নরপতি, আউধের একাদশতম শাসক স্বনামধন্য ওয়াজিদ আলি খান।মুঘল আমলের অপরাহ্নে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝলসে-ওঠা পারসিক ভাগ্যান্বেষী সাদত খানের শেষ উত্তরাধিকারী—আবদুল মুজাফর নাসিরউদ্দিন সিকান্দর ঝা, বাদশা-ই-আবদুল কাইজার-ই-জামান, সুলতান-ই-আলম ওয়াজিদ আলি শাহ বাদশা। সংক্ষেপে—ওয়াজিদ আলি শা।

বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদত আলি খানের আসল নাম ছিল মহম্মদ আমিন। তিনি জাতি পরিচয়ে পারসিক। আদি নিবাস ছিল খোরাসানের নৈশাপুর। সেখান থেকেই অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে আমিন হাজির হলেন মুঘলদের রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির মসনদে তখন সম্রাট ফারুখশিয়ার। নৈশাপুরী আমিনকে তিনি আশ্রয় দিলেন। সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর একজন সেনানায়কের পদ দেওয়া হল তাঁকে। ক্রমে আগ্রা শাসনের দায়িত্ব। ১৭১৯ সনে সম্রাট আবদুল্লা খান এবং হুসেন আলি নামক দুই ষড়যন্ত্রীর হাতে নিহত হন। কেউ কেউ মনে করেন আমিনও ছিলেন ষড়যন্ত্রীদের একজন। পরের বছর (১৭২০) নিহত হলেন আবদুল্লা খান এবং হুসেন আলি। তার পিছনেও নাকি হাত ছিল মহম্মদ আমিনের। ফারুকশিয়ারের পরে দিল্লির তখ্‌তে বসেছিলেন সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্। মহম্মদ আমিনকে তিনি পুরস্কৃত করলেন। তাঁর পদবি হল—সাদত আলি খান, বুরহান-উল-মুল্‌ক। সেই সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দিলেন পরিপূর্ণ একটি সুবা—আউধ। সাদত আলি আউধের সুবাদার। ওয়াজিদ আলি সেই বংশেরই উত্তরপুরুষ।

সাদত আলি মারা যান ১৭৩৯ সনে। তাঁর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা সদরুন্নিসাকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন আপন ভাইপো সফদরজংয়ের সঙ্গে। সাদত আলির মতোই সফদরজংও ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় (১৭৩৮) অযোধ্যা থেকে সৈন্য নিয়ে সাদত আলি যোগ দিয়েছিলেন মুঘল বাহিনীর সঙ্গে। নাদির শাহের হাতে তিনি বন্দীও হয়েছিলেন। নাদিরের সঙ্গে বাদশার আপস আলোচনার সময় তিনিই মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাজে খুশি হয়ে নাদির শাহ এবং মুঘল সম্রাট দু'জনই বিশেষ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন তাঁকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা সফদরজংও ছিলেন দিল্লির দরবারে একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। আউধ ছাড়া কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্মান জোটে ১৭৪৯ সনে, যখন দিল্লির সিংহাসনে বসেন সম্রাট আহামদ শাহ। সফদরজংকে তিনি 'উজির' পদে বরণ করে নিলেন। আউধের সুবাদাররা সেই থেকে—'নবাব ওয়াজির'।

দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উজিরের কাজ চালাতেন একজন প্রতিনিধি। কাশ্মীরেও তাই। সফদরজংয়ের আসল লক্ষ্য ছিল অযোধ্যা। নিজের সুবাকে গোছানোর দিকেই বেশি মনোযোগ ছিল তাঁর। সেখানেই ১৭৫৬ সনে দেহরক্ষা করেন তিনি। তাঁর মৃত্যু ও বাংলার সুবাদার সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণ একই বছরের ঘটনা। সফদরজংয়ের পরে আউধের অধীশ্বর হলেন পুত্র সুজাউদ্দৌলা। তাঁর আমলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আউধের শাসকদের প্রথম মুখোমুখি পরিচয়। পলাশির

যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা একজন প্রতিবেশী দর্শক মাত্র। কিন্তু মিরকাশিমের বিদ্রোহের পরে তিনি দর্শকের ভূমিকা থেকে নেমে আসেন লড়াইয়ের মাঠে। ১৭৬৩ সনে মিরকাশিম যখন তাঁর রাজ্যের সীমানা পার হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন আউধের সুবাদার সানন্দে বরণ করে নেন তাঁকে। তারপর দু'জনে একযোগে ইংরাজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বিহারে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন মুঘল সম্রাট শাহ আলমও। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) এই সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হল ইংরাজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরোর বাহিনীর কাছে। পরাজিত সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ১৭৬৪ সনের সেই এলাহাবাদ-চুক্তি অনুসারে সুজাউদ্দৌলা তাঁর রাজ্য ফেরত পেলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদ এবং কোরা হাতছাড়া হয়ে গেল। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ তথাকথিত মিত্রতার বন্ধন। ইংরাজরা প্রতিশ্রুতি দিল নবাব ওয়াজিদের রাজত্ব আক্রান্ত হলে কোম্পানি তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। অবশ্য সে ফৌজের খরচ মেটাতে হবে নবাবকে। পরে বার্ষিক মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কোম্পানি কিছু ফৌজও মোতায়েন করে আউধে। খাল কেটে সেই প্রথম কুমির আনা।

সুজাউদ্দৌলা মারা যান ১৭৭৫ সনে। তাঁর বয়স তখন মোটে ছেচল্লিশ বছর। কেউ বলেন তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ কলকাতার ইংরাজ কর্মচারীদের আচরণ। ইংরাজদের ব্যবহারে নাকি মন ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। কেউ বলেন—ফারুকবাদের নবাবনন্দিনীর ইজ্জত কেড়ে নিতে গিয়ে তাঁর হাতের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে জখম হয়ে প্রাণ হারান তিনি। দুই-ই সম্ভব। সুজাউদ্দৌলা একদিকে যেমন তুখড় শাসক, অন্যদিকে তেমনই চরম রমণীবিলাসী। তাঁর সম্পর্কে আলেকজাণ্ডার ডাউ লিখেছেন : রীতিমত দর্শনীয় পুরুষ সুজাউদ্দৌলা। মাথায় তিনি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। মজবুত শরীর। তলোয়ারের এক ঘায়ে তিনি মোষ কাটতে পারেন। তিনি কর্মঠ, আবেগপ্রবণ, উচ্চাকাঙ্খী। তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ। তাঁর মনে আগুন।.... তিনি আরও লিখেছেন—বক্সারের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর হারেমে আমোদপ্রমোদে সময় না কাটিয়ে সুজাউদ্দৌলা নজর দিয়েছেন অন্যদিকে। তিনি তাঁর সৈন্যদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, রাজকোষ পূর্ণ করে তুলতে চাইছেন, রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন মজবুত ভিতে। অন্যদিকে স্বদেশের ঐতিহাসিক আবদুল হলিম 'শরর' সুজাউদ্দৌলার এইসব গুণাবলি স্বীকার করে নিয়েই জানাচ্ছেন—"নবাব সুজাউদ্দৌলার ন' বছর কার্যকালের ফলশ্রুতি : ফয়জাবাদ। এই ন' বছরের মধ্যে বর্ষার মাত্র চার মাসই তিনি শহরে থাকতেন, বাকি সময়টা কাটত সরকারী কাজের দৌড়ঝাঁপে, ভ্রমণে ও শিকারে। স্বভাবতই সুজাউদ্দৌলার আসক্তি ছিল সুন্দরী রমণীতে, নাচে গানে। ফলে বারবণিতা ও নর্তকীদের খ্যাতি-পশার বেড়ে গেল, ভরে গেল অলিগলি। নবাবের অনুগ্রহ, ইনাম

(পুরস্কার) ইত্যাদির দৌলতে এরা এমন ধনবতী ও খুশহাল (সংগতিসম্পন্না) হয়ে উঠল যে, প্রায়ই বেশ্যাদের ডেরা লেগে থাকত, তার সঙ্গে দুটো-তিনটে করে বিশাল-বিশাল তাঁবু। নবাব সাহেব যখন জেলা পরিদর্শনে বা শুধুই ভ্রমণে বেরোতেন নবাবী তাঁবুর সঙ্গে এদের তাঁবুও ছ্যাকরা গাড়িতে চাপিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে রওনা হত।"... সুতরাং, সবই সম্ভব।

সুজাউদ্দৌলার পর আউধের সিংহাসনে বসেন পুত্র আসফউদ্দৌলা। ইংরাজরা নতুন করে সন্ধি করল তাঁর সঙ্গে। মিত্রতার ফাঁস আরও নিবিড় করে আনা হল। নবাবের খরচে স্থায়িভাবে মোতায়েন করা হল কানপুর ব্রিগেড। আসফউদ্দৌলার হাতে বিশেষ টাকা পয়সা নেই। সুজাউদ্দৌলার অর্থ ভাণ্ডার ছিল তাঁর বহুবেগমের হাতে। তা-ই নিয়ে মাতা-পুত্রে বিরোধ। আসফউদ্দৌলা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন লক্ষ্ণৌ। ফৈজাবাদে রয়ে গেল 'বহুবেগম সাহিবার' দরবার। কলকাতা থেকে কাউন্সিলের কর্তারা ফতোয়া দিলেন সুজাউদ্দৌলার টাকাপয়সার উত্তরাধিকারী তাঁর বেগম। এই অর্থ নিয়েই পরবর্তী কালে নানা অনর্থ। বিচারের সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল অযোধ্যার বেগমদের ওপর অবিচার এবং অত্যাচার। চাপ দিয়ে নগদ দশ লক্ষ পাউন্ড আদায় করা হয়েছিল তাঁর থেকে। আসফউদ্দৌলাও মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, ইংরাজের দেনা শোধ করার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। ফলে ১৭৭৫ সনে সিংহাসনে বসেই মায়ের কাছ থেকে তাঁকে ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা ধার করতে হয়। তার অর্ধেক তুলে দিতে হয় কোম্পানির হাতে। বাকি টাকায় আর ক'দিন চলে! নবাব অচিরেই অর্থকষ্টে পড়লেন। তিনি না পারছেন সৈন্যদের মাইনে জোগাতে, না নিজের এবং পরিবার-পরিজনের নবাবি চাল রাখতে। কোম্পানি কথা দিয়েছিল, তাঁর আর্থিক সমস্যা সুরাহা করার জন্য সৈন্যভার কিছুটা কমানো হবে। ১৭৭৭ সনে কোম্পানির আরও একটা ব্রিগেড চাপানো হয়েছিল নবাবের ওপর। ১৭৮১ সনে ওঁরা বললেন—ঠিক আছে, দ্বিতীয় ব্রিগেডের খরচ নবাবকে দিতে হবে না। কিন্তু কার্যত কিছুই করা হল না। এদিকে হেস্টিংস তথা কোম্পানিরও অর্থাভাব। বেনারসের রাজাকে ঠিক মতো দোহন করা সম্ভব হয়নি। হেস্টিংস অতএব তাকালেন ফৈজাবাদের বিধবা বেগমদের দিকে। আজব অভিযোগ আনলেন তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে, ওঁরা বেনারসের রাজার সঙ্গে কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন। বেগমদের গ্রেফতার করা হল। তাঁদের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার চলল। এবং এসব চলল আসফউদ্দৌলার অমত সত্ত্বেও। এভাবেই কোম্পানি সেদিন দশ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করেছিল সুজাউদ্দৌলার বিধবাদের থেকে। আসফউদ্দৌলাকেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি ওরা। হেস্টিংসের পরে তিনি বিচার চেয়েছিলেন কর্নওয়ালিসের কাছে।

কিন্তু কর্নওয়ালিসও অযোধ্যা থেকে কোম্পানির ফৌজ সরিয়ে নিতে রাজি হলেন না। শুধু এটুকুই বললেন ফৌজ বাবদে নবাব কোম্পানিকে যা দিচ্ছেন তা আর বাড়ানো হবে না। আসফউদ্দৌলা তখন কোম্পানিকে ফৌজ বাবদে নজরানা দিচ্ছেন বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা! পরবর্তী গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোরের আমলেও আসফউদ্দৌলার আউধ কোম্পানির কাছে কামধেনুর মতো। তারই মধ্যে অবাক-কাণ্ড করেছেন নবাব আসফউদ্দৌলা। মনের মতো করে তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর নতুন রাজধানী লক্ষ্ণৌ। 'দেখতে দেখতে দুনিয়ার যাবতীয় আনন্দ-উপকরণ এখানে এসে জড়ো হল,'—লিখেছেন 'শরর্'। তাঁর মন্তব্য: আসফউদ্দৌলার বাসনা ছিল নাকি একটিই—'হায়দরাবাদের নিজাম অথবা টিপু সুলতান, যিনিই হোন, কারও দরবারের আড়ম্বর এবং দব্‌দবা আমার দরবারের চেয়ে অধিক যেন না হয়!'

আসফউদ্দৌলা মারা যান ১৭৯৭ সনে। রেসিডেন্ট এবং গভর্নর জেনারেল লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে বসালেন তাঁর পুত্র ওয়াজির আলিকে। কিন্তু দু'বছরও গদিতে থাকতে পারেননি তিনি। অভিযোগ উঠল ওয়াজির আলি আসফউদ্দৌলার পুত্র নন। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখেছেন যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কোম্পানি তাঁকে রাজ্যহারা করে ইংল্যান্ডের আদালতে দু'চার পাউণ্ড খরচ করলেই তার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আসলে কোম্পানি তাঁকে বশে রাখতে পারছিল না বলেই এই শাস্তি। তাঁর কথা পরে।

ওয়াজির বদলে নবাব-গড়ার কারিগররা অতঃপর লক্ষ্ণৌর তখ্‌তে বসালেন সুজাউদ্দৌলার আর এক পুত্র, আসফউদ্দৌলার ভাই সাদত আলি খানকে। আসফউদ্দৌলার সঙ্গে মোটে তাঁর বনিবনা হত না। সে কারণে তিনি ইংরাজের ছায়ায় ছায়ায় থাকতেন। কখনও কলকাতায়, কখনও বেনারসে। ১৭৯৮ সনে বেনারস থেকেই ডেকে এনে রাজ্য তুলে দেওয়া হল তাঁর হাতে। তার আগে অবশ্য ইংরাজরা নতুন একটি সন্ধিপত্র সই করিয়ে নেয় তাঁকে দিয়ে। ওই চুক্তিতে সাকুল্যে তেইশটি ধারা ছিল। নবাব কোম্পানির ফৌজের ভরণপোষণের খরচ বাড়িয়ে দেবেন। এবার থেকে তাঁকে দিতে হবে বছরে ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা। নবাব বাইরের, অর্থাৎ কাছাকাছি বা দূরবর্তী কোনও ভারতীয় শাসকের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। নবাব কোম্পানিকে এলাহাবাদ দান করবেন। তবে এলাহাবাদ সুরক্ষার জন্য খরচ জোগাতে হবে নবাবকেই। নবাব কোনও ইউরোপীয়কে দরবারের কোনও কাজে নিয়োগ করতে পারবেন না। তা ছাড়া রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, শাসনব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, রাজকোষে আমদানি বাড়াতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় এই চুক্তি বলতে গেলে একটি দাসখত। সাদত্ আলি খানের পক্ষে মুখ বুজে তাতে সই করা ছাড়া আর

উপায় কী ! ১৭৯৮ সনের জানুয়ারিতে ইংরাজ ফৌজের পিছু পিছু লক্ষ্ণৌতে তাঁর প্রবেশ। স্বভাবতই পরে আরও নানাভাবে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে ইংরাজরা। বস্তুত পরের বছরই (১৭৯৯) লর্ড ওয়েলেসলি চেয়েছিলেন আউধকে কোম্পানির খাস তালুকে পরিণত করতে। সাদত আলি খান তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন ফৌজখাতে নজরানার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। তাতেও কোম্পানির ক্ষুধা মেটেনি। ওরা নতুন আর এক চুক্তিতে বাঁধল সাদত আলিকে। চুক্তি অনুযায়ী বলতে গেলে প্রায় অর্ধেক রাজ্যই চলে গেল কোম্পানির হাতে। 'শরর্' লিখেছেন—"যেহেতু সাদত আলি খাঁকে ইংরাজরাই সিংহাসনে বসিয়েছিল তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তাদের আধা-রাজত্ব ভেট দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, সাদত আলি খাঁর সিংহাসন আরোহণকালে আওধের রাজ্যসীমা অর্ধেক হয়ে গেল। লক্ষ্ণৌয়ের প্রাচীন লোকেরা শুনেছিলেন : এই দুঃখে সাদত আলি খাঁ খুব মিতব্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন, এবং অত্যন্ত কুশলতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বাইশ তেইশ কোটি টাকা জমিয়েছিলেন।"

সাদত আলি দেহরক্ষা করেন ১৮১৪ সনে। দেশীয় ঐতিহাসিকরা বলেন তাঁকে তাঁর এক শ্যালক বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। ইংরাজরা অবশ্য এমন অভিযোগ তোলেননি। তাঁরা এটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত যে, সাদত আলি রাজকোষ পূর্ণ করে রেখে গেছেন ! তাঁর পরে সিংহাসনে বসলেন পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দর। তিনি যখন রাজত্ব হাতে পেয়েছেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। রাজ্য পরিচালনায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ইংরাজ রেসিডেন্ট অতএব তাঁকে পেয়ে বসলেন। কাকে মন্ত্রী করা ঠিক, কাকে নয়, তা-ই নিয়ে চাপ সৃষ্টি। পেয়ে বসল কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলও। সাদত আলির সঞ্চিত অর্থ তারা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তখন নেপাল-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কোম্পানি গাজিউদ্দিন হায়দরের কাছে চেয়ে বসল দশ লক্ষ পাউন্ড। বলা হল—ধার। বার্ষিক শতকরা ছয় হারে সুদ গুনবে কোম্পানি। রেসিডেন্টকে বলা হল এমনভাবে টাকাটা আদায় করবে যেন মনে হয় নবাব বন্ধুভাবে কোম্পানিকে ধার দিচ্ছে। পরের বছর (১৮১৫) ধার করা হল আরও দশ লক্ষ পাইন্ড। নেপাল যুদ্ধের পর হিমালয়ের নীচে কিছু জমি নবাবকে সঁপে দিয়ে বলে দেওয়া হল—তামাম শোধ ! ১৮১৯ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস স্থির করলেন যিনি কোম্পানির জন্য এতখানি করছেন তাঁকে নিছক নবাব-ওয়াজির বলা ঠিক নয়। কোম্পানি গাজিউদ্দিন হায়দরকে 'রাজা' বানিয়ে দিলেন। তাঁর মাথায় তাজ তুলে দিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন দিল্লির বাদশার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবার বাদশা-গড়ার কারিগর ইংরাজ বাহাদুর। সেটা ১৮১৯ সনের কথা। গাজিউদ্দিন আর অযোধ্যার নবাব ওয়াজির নন, তিনি আউধের বাদশা, 'কিং অব আউধ।' সেই সুবাদে ওয়াজিদ আলিও ছিলেন

অযোধ্যার বাদশা। কলকাতায় যখন, তখন অবশ্য 'এক্স-কিং অব আউধ', অযোধ্যার ভূতপূর্ব বাদশা। 'শরর্' ঠিকই লিখেছেন, দিল্লির বাদশার অহংকার ভাঙবার জন্যই ইংরাজের এই চতুর চাল!

আউধের সিংহাসন থেকে বাদশা গাজিউদ্দিন বিদায় নিলেন ১৮২৭ সনের অক্টোবরে। তাঁর জায়গায় এলেন পুত্র নাসিরউদ্দিন হায়দর। তাঁকে নিয়েই উইলিয়াম নাইটনের বিখ্যাত বই 'দি প্রাইভেট লাইফ অব অ্যান ইস্টার্ন কিং।' কেউ কেউ বলেন তিনি গাজিউদ্দিনের পুত্র নন। গাজিউদ্দিনের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের অবশ্য একটি ছেলে ছিল। কিন্তু গাজিউদ্দিন তাঁকে সিংসাহন না দিয়ে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন নাসিরউদ্দিনকে। ফ্যানি পার্কস লিখেছেন—নাসিরউদ্দিন আসলে এক ক্রীতদাসীর সন্তান। এবং তাঁর জনক গাজিউদ্দিন নন, প্রাসাদের একজন রজক। 'শরর্' লিখেছেন—'নাসিরউদ্দিনের সময়টা, সত্যি বলতে কি, খুবই দুঃসময় ছিল। শাসনকার্য ছিল ঢিলেঢালা, ভোগবিলাসও স্বরচিত ধর্মোৎসবের ভিড়ে ফুরসতই মিলত না।' নাইটন ছাড়াও সমসাময়িক অনেকেই নাসিউদ্দিনের বিচিত্র আচার আচরণের বিবরণ রেখে গেছেন। সবাই তাঁর নিন্দায় মুখর। তাঁর দরবারে বিশেষ খাতির ছিল ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়দের। যে পঞ্চগোরা তাঁর কাছে নিত্য স্মরণীয় ছিলেন তাঁরা হলেন ডি রাসেট (de Russett) নামে একজন কেশশিল্পী, শিক্ষক রাইট সাহেব, চিত্রকর মানৎজ (Mantz), সেনাবিভাগের ক্যাপ্টেন ম্যাগনেস এবং গ্রন্থাগারিক ক্রোপলে (Croupley)। এঁদের মধ্যে নবাবের ওপর পরামানিকের প্রভাব ছিল নাকি সবচেয়ে বেশি। নাসিরউদ্দিনের একজন ফিরিঙ্গি বিবিও ছিলেন। তিনি জর্জ হপকিনস ওয়ালটারস নামে একজন ফৌজি সাহেবের মেয়ে। নাসিরউদ্দিনের হারেমে ফ্যানি পার্কস দেখতে পেয়েছিলেন তাঁকে। ইংরাজরা নাসিরউদ্দিনের নামে যত কালিই ছিটিয়ে থাকুক না কেন, তাঁর কাছ থেকেও ছলে বলে কৌশলে টাকা আদায় করতে কসুর করেনি। ১৮২৯ সনে শতকরা পাঁচ টাকা সুদে তারা নাসিরউদ্দিনের কাছ থেকে চৌষট্টি হাজার টাকা ধার করেছিল। নাসিরউদ্দিন শর্ত করেছিলেন তাঁর অবর্তমানে সুদের টাকা থেকে হারেমের চারজন বিবিকে ভাতা দিয়ে যেতে হবে। তালিকার অন্যতম ছিলেন এই ওয়ালটারস। নাসিরউদ্দিনের ভয় ছিল কেউ তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করবে। তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডি রাসেট, সেই গোরা-পরামানিক। তিনি নবাবের খাদ্য পরীক্ষা করতেন। নিজে খেয়ে তবে নবাবকে খেতে দিতেন। রেসিডেন্ট এবং কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে লক্ষ্ণৌ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর নবাবের ভয় আরও বেড়ে গেল। তিনি কারও হাতের জলটুকু পর্যন্ত খেতেন না। প্রাসাদের একটা কুয়ো তালা দিয়ে রাখতেন তিনি। চাবি ঝোলানো থাকত

তাঁর গলায়। নবাবের দু'জন বোন তালা খুলে জল এনে তুলে রাখতেন তাঁর ঘরে। শোনা যায় এই বোনরাই নাকি শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল তাঁকে।

নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু ১৮৩৭ সনে। তিনি যেদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন লক্ষ্ণৌয় সেদিন রীতিমত এক নাটক। নাসিরউদ্দিনের প্রধান বেগম ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহ আলমের এক নাতনি। তিনি নাকি নাসিরউদ্দিনের জীবনধারা পছন্দ করতেন না, আলাদা থাকতেন। নাসিরউদ্দিনের আর এক বেগম ছিলেন। তাঁর নাম আফজল মহল। ১৮২৫ সনে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জননী হন। ছেলের নাম রাখা হল মুন্না জান। স্থির হল এই মুন্না জানই হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যতের 'বাদশা'র জন্য হারেমে একজন ধাই মা নিযুক্ত করা হল। তার নাম দুলারি। দুলারির জীবন কাহিনী রহস্য উপন্যাসের মতো। এখানে তা অবান্তর। বহুবল্লভ দুলারি প্রাসাদে এসে নবাবকেও নাকি জয় করে নেয়। নবাব স্থির করলেন তিনি দুলারিকে বিয়ে করবেন। গাজিউদ্দিন হায়দর তখনও বেঁচে আছেন। নাসিরউদ্দিন কেঁদেকেটে তাঁর সম্মতি আদায় করলেন। সেটা ১৮২৬ সনের কথা। পরের বছর (১৮২৭) সিংহাসনে বসেই নাসিরউদ্দিন দুলারিকে পুরোপুরি বেগম বানিয়ে দিলেন। তার নাম হল—মালিকা জামানি। নাসিরউদ্দিনের হারেমে আসার আগে দুলারির একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছিল। ছেলের নাম কৈয়ান ঝা। নবাব পরিবারেই বিয়ে হল তার। মেয়ের বিয়েও একই প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে। তারপর দুলারি এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসল, নাসিরউদ্দিনের মুখ দিয়ে সে সরকারিভাবে ঘোষণা করাল মুন্না জান নয়, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এই কৈয়ান ঝা। নাসিরউদ্দিন বললেন—হ্যাঁ, কৈয়ান ঝা-ই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। রেসিডেন্ট নবাবের জবানবন্দী শুনে হতবাক। তিনি নবাবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন লক্ষ্ণৌয় সবাই জানে দুলারি যখন প্রাসাদে পা দেয় তখন এই কৈয়ান ঝা'র বয়স তিন বছর। নাসিরউদ্দিন তবু নাছোড়বান্দা। তিনি কৈয়ান ঝাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য এমনকি গভর্নর জেনারেলের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন। এদিকে মুন্না জানও কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। তার জন্মের পর গাজিউদ্দিন হায়দর নাকি রেসিডেন্টকে বলেছিলেন মুন্না জান তাঁর পৌত্র নয়। যে কোনও কারণেই হোক, হয়তো তিনি তখন বেগমের ওপর রুষ্ট। তাই গাজিউদ্দিন এমন কথা উচ্চারণ করে বসেছিলেন। পরে গাজিউদ্দিন নাকি তাঁর মত বদলেছিলেন, মৃত্যুর আগে বলেছিলেন—মুন্না জান আমার নাতি বটে। রেসিডেন্ট সত্য নির্ধারণের জন্য তথ্যতালাশ শুরু করলেন। ১৮৩০ সনে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন মুন্না জান নাসিরউদ্দিনের সন্তান নয়। ১৮৩২ সনে অবার চমক সৃষ্টি করলেন নাসিরউদ্দিন। তিনি ঘোষণা করলেন—না মুন্না জান, না কৈয়ান ঝা, দু'জনের কেউই আমার সন্তান নয়। বোঝা যায়, দুলারির খাতির তখন কমতির দিকে।

তারপর এই নিয়ে প্রকাশ্যে নোংরা কাপড় কচাকাচি। সুতরাং, কাগজেকলমে উত্তরাধিকারী-হীন নাসিরউদ্দিন যেদিন মারা গেলেন সেদিন লক্ষ্ণৌয় তুমুল কাণ্ড। নাসিরউদ্দিনের মা 'বাদশা বেগম' মুন্না জানকে সিংহাসনে বসাবার জন্য তৎপর হলেন। তাঁর সমর্থক লক্ষ্ণৌর আমজনতা। অন্যদিকে রাজা গড়ার সত্যিকারের করিগর রেসিডেন্ট বসাতে চান সাদত আলি খাঁর আর এক পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দরের ভাই মুহম্মদ আলি শাহকে। তাই নিয়ে প্রাসাদে এবং প্রাসাদের বাইরে প্রবল উত্তেজনা। হইহল্লা, গোলাগুলি। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত জয়ী হল ইংরাজরাই। সিংহাসনে বসলেন বৃদ্ধ মুহম্মদ আলি শাহ। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় লক্ষ্ণৌর দরবারে ইংরাজের আধিপত্য কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মুহম্মদ আলি শাহকে সিংহাসনে বসাবার আগেই রেসিডেন্ট তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন আরও একটি চুক্তিপত্র।

ক'সপ্তাহ পরে সেই চুক্তিই পরিবর্তিত চেহারায় পেশ করা হয় নতুন নবাবের সামনে। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন—১৮০১ সনে সাদত আলি নগদ টাকা দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অর্ধেক রাজত্বই তুলে দিয়েছিলেন ইংরাজের হাতে, এবার (১৮৩৭) বিপুল পরিমাণ নগদ আদায়েরও বন্দোবস্ত হল। 'সিংহাসনে আরোহণের সময়' 'শরর্' লিখছেন—"মুহম্মদ আলি শাহর বয়স ছিল তেষট্টি। বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ। সময়ের উত্থান-পতন, দরবারের বালকোচিত আচরণ, সবই দেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল : তিনি ছিলেন নবাব সাদত আলি খাঁর পুত্র, পিতার মেজাজ দেখেছেন। ফলে খুব সতর্কভাবে কাজ করতে লাগলেন, মিতব্যয়ের পরিকল্পনা তৈরি করলেন, এবং যতদূর সাধ্য, শাসন ব্যবস্থাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।" কিন্তু ১৮৩৭ সনের চুক্তির পরে সেটা কি আর সম্ভব ?

মুহম্মদ আলি শাহ্ দেহরক্ষা করেন ১৮৪২ সনে। সিংহাসনে বসলেন পুত্র আমজাদ আলি শাহ। 'শরর্' লিখেছেন—"মুহম্মদ আলি শাহ চেষ্টা করেছিলেন যুবরাজের শিক্ষাদীক্ষা যেন উচ্চকোটির হয়। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে রেখেছিলেন বিদ্বজ্জনের সংসর্গে। কিন্তু আমজাদ আলি শাহ পড়াশোনায় বিশেষ এগোতে পারেননি। তার পরিবর্তে স্বভাবে আচরণে শিষ্টাচারে একজন সাচ্চা মৌলবি হয়ে উঠলেন। প্রজারা তাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করত। শাসনের বল্গা হাতে আসার পর এই একটি মাত্র যোগ্যতারই পরিচয় তিনি দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু একথা সকলেরই জানা যে, নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও দেশনেতার রাজনীতির মধ্যে কোনরকম আত্মীয়তা হতে পারেনা।"

তাঁরই পুত্র এই ওয়াজিদ আলি শাহ। আমজাদ আলি শাহর দ্বিতীয় পুত্র তিনি। অযোধ্যার নবাবদের ইতিবৃত্ত, বলাই বাহুল্য সরলরেখা ধরে চলেনি। আসফউদ্দৌলার সন্তান হয়েও ওয়াজির-আলি সিংহাসন রাখতে পারেননি, ইংরাজরা তাঁর জায়গায়

বসিয়েছিল সাদত আলিকে। নাসিরউদ্দিন হায়দারের পরে আবার মুন্না জানকে নিয়ে নানা কাণ্ড। ডাক পড়েছিল সাদত আলির এক বিস্মৃত পুত্র মুহম্মদ আলি শাহের। ওয়াজিদ আলির ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনও বিতর্কের অবকাশ ছিল না। হারেম-বাসিনী এলু জান তার কাহিনীতে বলেছিল আমজাদ আলি শাহ মারা যান বিষপ্রয়োগের ফলে। অন্তত তাঁর প্রধান বেগম নাকি তা-ই সন্দেহ করতেন। কিন্তু সবাই জানেন, আমজাদ আলির মৃত্যুর কারণ এক দুরারোগ্য ক্ষত। ওয়াজিদ আলি তাঁকে হেকিমের হাত দিয়ে বিষ প্রয়োগ করেছেন এমন কথা কেউ কোনওদিন বলেননি। দ্বিতীয় পুত্র হয়েও তিনি সিংহাসন পেয়েছিলেন, কারণ, প্রথম পুত্র মুস্তফা আলি ছিল বাতিল বলে গণ্য। পিতাই তাঁকে মনোনীত করেছিলেন উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার বিনা বিতর্কে ইংরজরাও মেনে নিয়েছিল। সুতরাং, লক্ষ্ণৌর প্রাসাদ ঘিরে যত কলঙ্ক-কথাই প্রচারিত হোক না কেন, ইংরাজের রাজধানীতে নবাগত রাজ্যহারা অযোধ্যার এই 'বাদশা'-র দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবার কোনও কারণ নেই।

ওয়াজিদ আলি সিংহাসনে বসেন ১৮৪৭ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ। আর অচেনা শহর কলকাতায় যখন তিনি পৌঁছেছেন বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। কেউ কেউ বলেন আরও কম, চৌত্রিশ। তা হলে অবশ্য তিনি গদিতে বসেন ছাব্বিশ নয়, চব্বিশ বছর বয়সে। মাত্র দু' মাস আগে, ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে (১৮৫৬) তাঁর বিশাল রাজত্ব পরিণত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাস তালুকে। ওরা তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে। তাঁর এখন 'তাজ' নেই, তখ্ত নেই। তিনি আর 'কিং' নন, 'এক্স কিং অব আউধ।' কোম্পানির রাজধানীতে নিতান্তই একজন ভাগ্যান্বেষী যেন। যেমন ছিলেন সপ্তদশ শতকে দিল্লির দরবারে তাঁর পূর্বপুরুষ মহম্মদ আমিন, ওরফে সাদত আলি খান। পার্থক্য এই, সাদত আলি খুঁজছিলেন সেদিন মনের মতো কোনও জায়গির, আর ওয়াজিদ আলি এসেছেন তাঁর হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধারের বাসনায়। সাদত আলির হাতে সেদিন বলতে গেলে হারাবার মতো কিছুই ছিল না। ওয়াজিদ আলি শাহ সদ্য খুইয়ে এসেছেন বিশাল রাজ্য আউধ, সেই সঙ্গে প্রিয় শহর লক্ষ্ণৌ।

আরব্য উপন্যাস পড়তে পড়তে যে ছবিগুলো কল্পনায় ফুটে ওঠে সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে একমাত্র এই লক্ষ্ণৌ শহরেই—লিখেছিলেন বিদেশিনী এমা রবার্টস। ১৮৩০ সনে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন তিনি বেড়াতে। দেখে চমৎকৃত। ক'বছর পরে বলতে গেলে সমান অভিভূত গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের দুই বোন এমিলি আর ফ্যানি ইডেন। সিংহাসনে তখন মুহম্মদ আলি শাহ। তিনি অসুস্থ, সুতরাং সশরীরে গভর্নর জেনারেলকে সংবর্ধনা জানানো সম্ভব নয়। লর্ড অকল্যান্ড অতএব শহরে ঢোকেননি। সাড়ম্বরে শোভযাত্রা সহকারে গভর্নর জেনারেলের ছাউনি অবধি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়ে এসেছিলেন যুবরাজ আমজাদ আলি। এমিলি এবং ফ্যানিকে আদর আপ্যায়নের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন তিনিই। লক্ষ্ণৌয় পৌঁছে দুই বোন যা দেখেন তাতেই আপ্লুত। প্রাসাদের বিলাসবৈভব তো বটেই, এমনকি শহরের ঘরবাড়ি দেখেও তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক। সাদত আলির সমাধি, দিলখুসা, ইমামবাড়া···। ইমামবাড়া এবং রোমি দরওয়াজা দেখে এমিলির মন্তব্য—এদেশে এখনও এমন আশ্চর্য সুন্দর কোনও অট্টালিকা দেখিনি। এই সব ঘরবাড়ি যদি এক সপ্তাহ ধরে অনবরত স্কেচ করতে পারতাম! ওঁদের জন্য যুবরাজের প্রাতরাশের আয়োজন দেখে তাঁর মনে পড়েছিল আরব্য উপন্যাসের কথা,—'ওয়াজ কোয়াইট অ্যাজ অ্যারাবিয়ান নাইটস অ্যাজ আই মেন্ট ইট টু বি!' খাওয়া-দাওয়ার পর বজরায় চড়ে নদীপথে নবাবের বাগানবাড়িতে।—'সাচ এ প্লেস! দি ওনলি রেসিডেন্ট আই হ্যাভ কোভেটেড ইন

ইন্ডিয়া !’ ভারতে এমন একটি আস্তানাই কামনা করেছিলাম আমি !—লিখছেন এমিলি। বলছেন, অ্যারাবিয়ান নাইটসের সেই জায়গাটা মনে আছে ? খলিফার তজবির-মহলের বদলে জোবেদি সেখানে বাজি রাখছে তার প্রমোদ কানন ? এমিলি লিখছেন—এই সেই প্রমোদকানন দি গার্ডেন অব ডিলাইটস ! ১৮৫৮ সনে শহর যখন প্রায় বিধ্বস্ত তখনও গোমতীতীরের এই নগরের রূপ দেখে অভিভূত লন্ডনের ‘দি টাইমস’ কাগজের বিখ্যাত প্রতিবেদক উইলিয়াম রাসেল। অনেক দেশ ঘুরেছেন তিনি। এদেশে এসেছিলেন মহাবিদ্রোহের বিবরণ পাঠাতে। বলতে গেলে লক্ষ্ণৌ তখনও জ্বলছে। রাসেল তবু লিখছেন—রোম, অ্যাথেন্স, কনস্টান্টিনোপল, কোনও শহরের তুলনা চলে না লক্ষ্ণৌর সঙ্গে। সৌন্দর্যে লক্ষ্ণৌ সব শহরকে ছাড়িয়ে যায়।

কলকাতা নয়, সত্যিকারের প্রাসাদপুরী তখন লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌকে যিনি প্রথম মনের মতো করে সাজাতে উদ্যোগী হন তিনি নবাব আসফউদ্দৌলা। অবশ্য তাঁর আগেও লক্ষ্ণৌ ছিল। পুরানো শহরের কাছাকাছি সফরদরজং গড়েছিলেন তাঁর কেল্লা—মচ্ছি ভবন। নামটা নাকি সাদত খানের দেওয়া। কিন্তু আধুনিক লক্ষ্ণৌর সত্যিকারের সূচনা আসফউদ্দৌলার হাতে। মুঘলদের মধ্যে প্রাসাদ-পাগল বলতে যদি শাজাহান, তবে লক্ষ্ণৌর নবাবদের মধ্যে সমান পাগল এই আসফউদ্দৌলা। মচ্ছিভবনের পশ্চিমে গোমতীর তীরে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বিখ্যাত দৌলতখানা, ইমামবাড়া, মসজিদ এবং রোমি-দরওয়াজা। কনস্টানন্টিনোপলের একটি প্রসিদ্ধ তোরণের ভারতীয় সংস্করণ এটি। তারপর তৈরি হল শহরের বাইরে নদীর ওপারে বিবিয়াপুরের প্রাসাদ এবং উদ্যান। তারপর চানহাটের বাগানবাড়ি, আয়েশাবাগ এবং চার বাগের ঘরবাড়ি। বছরে গড়ে দশ লাখ টাকা নাকি খরচ করতেন আসফউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌকে সাজাবার জন্য। ইমামবাড়া আর মসজিদের জন্যই খরচ হয়েছিল কুড়ি লক্ষ টাকা। আসফউদ্দৌলা শাসক হিসাবে যা-ই হোন না কেন, লক্ষ্ণৌবাসীর চোখে তিনি ময়দানবের মতো। দরাজ হাতে খরচ করতেন তিনি নগরসজ্জার জন্য। তাঁর দানধ্যান, বিলাসিতা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্ণৌয় প্রবাদের মতো। তাঁর দানশীলতার কথা স্মরণ করে একশ’ বছর পরেও লক্ষ্ণৌর দোকানিরা নাকি সকালে ঝাঁপ তুলতে তুলতে বলতেন—‘ইয়া আসফউদ্দৌলা ও অলি।’ আসফউদ্দৌলা তাঁদের কাছে অভিভাবক, পূজ্য। গোমতীর ওপর পাথরের সেতু এবং চকের বাজার তাঁরই কীর্তি। তাঁর আমলে যেসব মহল্লা গড়ে ওঠে তার মধ্যে ছিল আমানিগঞ্জ, ফতেগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, বালকগঞ্জ, কাশ্মীরি মহল্লা—ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষ্ণৌর অন্যতম দর্শনীয় ক্লড মার্টিনের ‘কনস্টানসিয়া’। তাঁর আমলের অহংকার। লোকে বলে ‘মার্কিন সাহেব কা কোঠি।’

নবাবদের সবাই কিছু না কিছু উপহার দিয়েছেন লক্ষ্ণৌকে। সাদত আলি

জেনারেল মার্টিনের কাছ থেকে কিনেছিলেন 'ফরহন বখ্‌শ' নামে একটি প্রাসাদ। লক্ষ্ণৌয় দর্শনীয় যা কিছু অট্টালিকা সবই নবাবদের সম্পত্তি। অন্য কারও সাহস ছিল না নবাবদের চোখের সামনে সুদৃশ্য কোনও বাড়ি তৈরি করেন। নবাবের চোখে সেটা ঔদ্ধত্য বলে মনে হতে পারে। তা ছাড়া বাড়িটি মনে ধরে গেলে তিনি নিশ্চিত কিনে নেবেন। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই বিদেশিরা মাঝে মাঝে গড়তেন শৌখিন বাহারি অট্টালিকা। নবাবরা, বলাই বাহুল্য, কখনও তাঁদের হতাশ করেননি। বস্তুত জেনারেল মার্টিন তাঁর নিজের বসত বাড়িখানা নবাবের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন অনেক কৌশলে। ও বাড়িতে তিনি নিজেকে সমাহিত করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণেই 'কনস্টেশিয়া' আজও 'মার্কিন সাহেব কা কোঠি।' রেসিডেন্সির আদি বাড়িও আসফউদ্দোলার তৈরি। সাদত আলি সাহেবদের জন্য গড়লেন নতুন বাড়ি 'টেঢ়ী কোঠি।' দরবারের জন্য তৈরি হল লাল-বারহদরি। তারপর মুনব্বর-বখশ, খুরশিদ মঞ্জিল, চ্যাপড়া -কা আস্তাবল। সবই তৎকালে দেখবার মতো। সাদত আলির আর এক কীর্তি মোতিমহল। মোতির মতোই টলটলে নাকি তার সৌন্দর্য। তাঁর আমলেই গড়ে ওঠে সাদতগঞ্জ, মকবুলগঞ্জ, মৌলভিগঞ্জ, রাস্তেগিগঞ্জ এবং আরও কিছু কিছু মহল্লা। লক্ষ্ণৌ দেখতে দেখতে গায়ে গতরে বেড়ে উঠছে।

গাজিউদ্দিন হায়দর মোতিমহলের কাছে তৈরি করালেন মুবারকমঞ্জিল আর শাহ মঞ্জিল। হাজারিবাগ নামে একটি মুক্তাঙ্গন চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সেখানেই আয়োজিত হত লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত নবাবি আমোদ জন্তুজানোয়ারের লড়াইয়ের আসর। এমিলি ইডেন সে-লড়াই দেখতে যাননি। কারণ, অন্যরা তাঁকে মানা করে দিয়েছিলেন। কেননা, অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু অনেক বিদেশিই নবাবদের সঙ্গে উপভোগ করেছেন এই লড়াই। গাজিউদ্দিনের এই আসর যেন তাঁদের কাছে ইতিহাসের রোমান অ্যাম্পিথিয়েটার। নাসিরউদ্দিন হায়দরের মতো গাজিউদ্দিন হায়দরেরও নাকি একজন বিলিতি বিবি ছিলেন। নবাব তাঁর জন্য গড়েছিলেন বিলাতিবাগ। তার ক'পা দূরে রসুল কি ইমারত। এই গাজিউদ্দিনই আউধের প্রথম 'কিং,—বাদশা। সুতরাং মচ্ছিভবনের কাছে নতুন বাজার বসল—বাদশাগঞ্জ। তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন হায়দর নদীর ওপারে গড়ে তুললেন—কারবালা। নতুন দু'একটি মহল্লারও পত্তন করেছিলেন তিনি। তাঁর ছিল ইংলিশ ফ্যাশন। বিলিতি জিনিস বলতে তিনি পাগল। বিলাত থেকে যন্ত্রপাতি এনে তিনি গড়লেন তারেওয়ালি কোঠি। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য এক গবেষণাকেন্দ্র। দূরবিন এবং যন্ত্রপাতি ঠিক মতো বসাবার জন্য একজন দক্ষ বিদেশি বিশেষজ্ঞকেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। ওয়াজিদ আলি শাহের সময়েও বাড়িটি ছিল। ধ্বংস হয়ে যায় নাকি গদরের সময়। অর্থাৎ, আঠার শ' সাতান্নর বিস্ফোরণের দিনে।

মুহম্মদ আলি শাহ লক্ষ্ণৌর অঙ্গে তুলে দিলেন আরও একটি গহনা, নতুন একটি ইমামবাড়া। তার কাছাকাছি দিল্লির জামা মসজিদের আদলে গড়া বিশাল মসজিদটিও তাঁরই কীর্তি। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো একটি অট্টালিকা গড়ার বাসনাও ছিল তাঁর। 'সাতখণ্ডা' বা সাততলা সেই আজব সৌধের পাঁচতলা মাত্র তিনি তৈরি করে যেতে পেরেছিলেন। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার আগেই নবাবের দেহান্ত। চকের রাস্তার দু'ধারে সার সার বাড়ি তাঁরই আমলে তৈরি। ওয়াজিদ আলির বাবা আমজাদ আলি শাহ শাসক হিসাবে হয়তো কীর্তিমান নন, কিন্তু আজও লক্ষ্ণৌয় রয়েছে তাঁর উদ্যমের স্বাক্ষর। লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর পর্যন্ত পাকা সড়কটি তাঁর কীর্তি। আর এক কীর্তি গোমতীর ওপর লৌহ সেতুর বন্ধন। এই সেতুটির জন্য বিলাতে অর্ডার পাঠিয়েছিলেন সাদত আলি। জেসপ নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেতুর সাজসরঞ্জাম নিয়ে লক্ষ্ণৌ পৌঁছন তিরিশ বছর আগে। মালপত্র পৌঁছবার কিছুদিন পরেই সাদত আলির মৃত্যু। সেতুর অংশাদি বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল রেসিডেন্সির সামনে নদীর ধারে। অবশেষে আমজাদ আলি খান সেতু বন্ধন করলেন। তাঁর আমলেই লক্ষ্ণৌর বিলাসবাজার হজরতগঞ্জ। উজির আমিনউদ্দৌলা পত্তন করলেন আর এক জমজমাটি বাজার আমিনাবাদ। দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই বাজারের পত্তন করতে।

ওয়াজিদ আলি নিজেও মনের মতো করে সাজাতে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রিয় নগরী লক্ষ্ণৌকে। তাঁর অনুপম কীর্তি কাইজার-বাগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন—ক্যয়সর বাগ। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সুন্দর বাগান, মধ্যে সার সার দোতলা বাড়ি। অন্দরের বাগানে গাছগাছালির ছায়ায় জিল্যওখানা,—আস্তাবল। মাঝখানে বিশাল প্রাসাদ— বারহ্‌দরি। আশপাশে আরও কয়টি সুন্দর ইমারত। কাইজার-বাগের পুব দিকের ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলে—চীনা বাগ। সেখান থেকে বাঁয়ে বাঁক নিলে জলপরি-ফটক। বাদশা নয়, এখানে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর বিশ্রামগৃহ। ফটকের অন্যদিকে হজরতবাগ। তার ভিতরে রুপোর পাত দিয়ে মোড়া বাহারি প্রাসাদ চাঁদিয়ালি বারহ্‌দরি। তার গায়েই বাদশার নিজের বিশ্রামশালা—খাস মকাম। কাইজার বাগ থেকে বেরিয়ে অন্য দিকে ঘুরলেই দেখা যাবে অনেক দূর অবধি চলে গেছে ইমারতের সারি। এখানেই বেগমদের জন্য চার লাখ টাকায় কেনা বিশাল প্রাসাদ বিখ্যাত—চ্যওলখ্‌কি। কাইজার বাগের পশ্চিম দিকের ফটকের বাইরে ছিল রৌসনউদ্দৌলার বাড়ি। ওয়াজিদ আলি শাহ সেটিও কিনে নেন। নাম রাখেন—কাইজার-পছন্দ্। সেখানে থাকতেন তাঁর অনেক প্রেমিকার একজন নবাব মাশুক মহল। হিলটন সাহেবের লেখা শহরের প্রসিদ্ধ গাইড-বুক কিংবা 'শরর'-এর বর্ণন যত চমকপ্রদই হোক, তাতে বড়জোর সেদিনের লক্ষ্ণৌর একটা রূপরেখাই মেলে।

ওয়াজিদ আলি যে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এসেছেন আজ আর তা কল্পনাও করা যায় না। লক্ষ্ণৌর আকাশে সেদিন গম্বুজ আর মিনারের কারুকার্য। চারদিকে প্রাসাদ, মসজিদ, বাজার, বাগবাগিচা, ফোয়ারা। স্থানীয় বাসিন্দারা গর্ব করে বলতেন লক্ষ্ণৌ আমাদের 'আখতার নগর',—স্বর্গীয় শহর। কেউ কেউ বলতেন—'হিন্দুস্থানের বাবুল।' লক্ষ্ণৌ ভারতের ব্যাবিলন।

কোম্পানির এলাকায় তখন মহানগর বলতে চারটি—কলকাতা, বোম্বাই, বেনারস আর এই লক্ষ্ণৌ। ওয়াজিদ আলির সময়ে অন্তত পাঁচ লক্ষ লোকের বাস লক্ষ্ণৌয়। অযোধ্যায় নাকি পঞ্চাশ লক্ষ। হিসাবটা সম্ভবত ভুল। কারণ, ১৮৬৯ সনে আদমসুমারি করে জানা যায় আউধের লোক সংখ্যা এক কোটি পনের লক্ষ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি লক্ষ্ণৌর জনসংখ্যা অতএব বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। শহরের জনপথে সেদিন অষ্টপ্রহর জনতার ভিড়। নাইটন-এর বইয়ে ('প্রাইভেট লাইফ অব অ্যান ইস্টার্ন কিং') বিদেশি দর্শক লক্ষ্ণৌর পথে পথে নাগরিকদের যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার চিত্র এঁকেছেন তা মোটেই কাল্পনিক নয়। তিনি লিখেছেন : বিশপ হিবার প্রাসাদের চারপাশের রাস্তাগুলোকে তুলনা করেছেন ড্রেসডেন-এর সঙ্গে। লক্ষ্ণৌ দেখে কারও কারও মনে পড়েছে মস্কোর কথা। আমি ওই দুই শহর দেখিনি। তবে শহরের একাংশে সরু রাস্তা, মাল বোঝাই উট আর বাজারের ভিড় দেখে আমার মনে পড়েছে গ্রান্ড কায়রোর কথা। তবে পার্থক্য আছে কিছু। বিশ্বের কোনও শহরেই বোধহয় জনপথে এত সশস্ত্র মানুষ চোখে পড়বে না। এ শহরের সকলেরই কোমরে তলোয়ার, বুকে অথবা পিঠে ঢাল। কারও কারও কোমরে পিস্তল, কারও কাঁধে বন্দুক। তাঁর কাছে সমান চমকপ্রদ ঠেকেছে উট আর হাতির যদৃচ্ছ ব্যবহার। সরু গলি দিয়েও হেলেদুলে চলেছে হাতি, নয়তো উট। এই বিবরণের সঙ্গে বিশপ হিবারের বর্ণনাও দিব্যি মিলে যায়। তিনি লিখেছেন—রাস্তার বাঁকে বাঁকে এবং বাড়ির সিঁড়িতে বসে আছে ভিখারির দল। অবাক হয়ে দেখলাম, অন্য নাগরিকদের সকলেই সশস্ত্র। হয়তো সেটা পুলিশের অকর্মণ্যতার কথাই বলে, তবে এদের জন্য জনপথের দৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। মোল্লার মতো দেখতে গম্ভীর-দর্শন লোকেরা পালকি চড়ে চলেছেন, পিছনে তলোয়ারধারী প্রহরী এবং অনুচরের দল। আরও খানদানি লোক যাঁরা তাঁরা চলেছেন হাতির পিঠে। পিছনে ঘোড়সওয়ার তাদের হাতে তলোয়ার, বর্শা, অথবা বন্দুক। যারা মিছেমিছি ঘুর ঘুর করছে তাদের কাঁধেও ঢাল, হাতে তলোয়ার।

তার মানে এই নয়, লক্ষ্ণৌয় দিনরাত্তির লড়াই চলছে। এই অস্ত্রসজ্জা অতীতের অবশেষ, অলঙ্কার মাত্র। লক্ষ্ণৌর অন্য গহনাও ছিল। সে সবের কথা পরে। আপাতত এটুকুই মনে রাখতে হবে, লক্ষ্ণৌ বেনারস কিংবা দিল্লির মতো প্রাচীন নগরী নয়। লক্ষ্ণৌ

বরাবর আউধের রাজধানী শহর ছিল না। প্রথম তিনজন নবাব তাঁদের রাজত্ব চালাতেন দিল্লি নয়তো ফৈজাবাদ থেকে। ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌয় রাজধানী সরিয়ে আনেন চতুর্থ নবাব আসফউদ্দৌলা। শহরের পরিচয়ে লক্ষ্ণৌর আবির্ভাব কলকাতার প্রায় একশ' বছর পরে, ১৭৮০ সনে। তবু কলকাতার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে সেদিনের লক্ষ্ণৌ। কি ধন দৌলতে, কি সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে।

হজরতগঞ্জ, আমিনাবাদ, চকবাজার—লক্ষ্ণৌর এই তিন বাজারে দেশ বিদেশের সওদাগরদের ভিড়। সোনা, রুপো, জড়োয়া গহনায় ভারতময় লক্ষ্ণৌর খ্যাতি। 'শর্‌র' লিখেছেন—"দিল্লির অভিজাত বংশের মহিলারা যখন লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন, তাঁদের পরিধানে ছিল সেইসব জেবর, যা সারা হিন্দুস্তানে ও খোদ দিল্লিতে প্রচলিত ছিল। এখানে আসার কয়েকদিন পরেই যখন এখানে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠল, অলংকারকে তখন শুধুই শৃংগারের সাধনমাত্র বলে মনে করা হত। এবং অধিকাংশ গহনাই প্রতিদিন হালকা, নাজুক ও সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল।... লখনউয়ে যে রকম হালকা গয়না তৈরি হতে লাগল, এমন আর কোথাও না।" তাঁর মতে—"সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে, যখন রেলপথ হিন্দুস্তানের শহরগুলিকে এমন মৈত্রী ও ঐক্যের সূত্রে বেঁধে দেয়নি, তখন লখনউয়ের চেয়ে ভালো স্বর্ণকার ও কারিগর আর কোথাও ছিল না।" পোশাকেও লক্ষ্ণৌর অবদান অনেক। পুরুষ এবং নারীর বেশ ভূষা নিয়ে অনেক কাণ্ডই করেছেন লক্ষ্ণৌর নাগরিকরা। ওয়াজিদ আলির কালে চাপকান আর আংগরাখা মিলিয়ে সেখানে তৈরি হয় আচকান। সারা ভারতে চল ছিল। সেই আচকানই হায়দরাবাদে পৌঁছে নাকি রূপান্তরিত হয় শেরওয়ানিতে। পাজামা থেকে টুপি—পুরুষের পোশাকে আরও রকমারি পরিবর্তন ঘটে লক্ষ্ণৌয়। পাঁচপানওয়ালি টুপি, দুপলড়ি টুপি, আলমপছন্দ টুপি, মিজদিল টুপি—কত ধরনের টুপি যে চালু ছিল শহরে তার লেখাজোখা নেই। মেয়েদের পোশাকেও অনেক কারিকুরি দেখিয়েছেন লক্ষ্ণৌর নবাববেগমরা। ভুবন-খ্যাত চিকনের কাজ, কে না জানেন, সে তো লক্ষ্ণৌরই অবদান। তারপর জুতো। "শাহী পর্বে এক নতুন গড়নের ছোট ছুঁচলো ডগাওয়ালা জুতোর আবিষ্কার হয়।"—লিখেছেন 'শর্‌র'। তিনি জানাচ্ছেন—"দিল্লিওয়ালা ও সালিমশাহীর ডগা যেখানে ঊর্ধ্বমুখী, এখানে তাকে সেলাই করে উলটে অন্দরমুখী করে দেওয়া। শুধু পাশে একটুখানি তোলা থাকত। এই জুতো বানানো হত লাল নরী-র (নরম চামড়ার) এবং খুবই হালকা ও সুন্দর হত। সেকালীন রুচি এই হালকাকে এতো হালকা করে দিয়েছিল যে, কোন কোন মুচির তৈরি এক জোড়া জুতো ওজনে চারপয়সার বেশি ভারী হত না।" তারপর শুরু হল জুতোর রূপসজ্জা। মখমলের জুতো, 'কিমুখত'-এর জুতো, আলপাকার বানাত-এর জুতো। কিমুখত হল ঘোড়া বা গাধার চামড়ার রূপান্তরিত

চেহারা। তার পর শুরু হল সল্‌মা-চুমকির কাজ, সোনালি রুপোলি তারের ঝুমকো, নয়তো জরির বাহার। ফ্যাশনে লক্ষ্ণৌ সেদিন সত্যিই যেন প্রাচ্যের প্যারিস। এই তুলনাটাও 'শরর্‌'-এর।

শুধু পোশাক আশাকে নয়, সব কিছুতেই লক্ষ্ণৌ এক আশ্চর্য বিলাসী শহর। এখানকার চীনামাটি এবং ধাতুর বাসনপত্রে কারুকর্ম দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনকি এখানকার মাটির বাসনপত্রেরও বুঝি বা তুলনা নেই। লক্ষ্ণৌর মাটির সুরাহি, ঝাঁঝরি, হুঁকো, আবরোধা (জলপান পাত্র) এবং 'খির-কি-হান্ডিয়া' যিনি দেখেন তিনিই তারিফ করেন। "হুঁকোর জগতে লখনউয়ের অবদান : 'পেচওয়ান' (লন), 'চিলম' (কলকে) ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার-প্রকারের সংস্কার। দিল্লির হুঁকো ছিল বাজে ও কুরূপা। লখনউয়ে এসে হল অধিকতর কাজের এবং রূপবতী। তামা, পেতল, দস্তা এবং 'ফুল'-এর (এক রকম ধাতুর) হুঁকো তো ছিলই, মাটির হুঁকোও এমন সুন্দর তৈরি হত, সূক্ষ্মতা ও সুকুমারতার এমন আশ্চর্য নিদর্শন, লোকেরা তাকেও ভালবেসে ফেলল।" মাটির হুঁকোর মধ্যে সবচেয়ে মনোহরটি বানিয়েছিলেন নাকি আজিম উল্লাহ খান। লোকে বলত—'আজিম উল্লাহ খানি হুক্‌কা!' 'খানিরা' এবং 'খুশবু' মিশিয়ে তামাকেরও স্বাদ গন্ধ বিলকুল পাল্টে দিয়েছিল লক্ষ্ণৌ। সেই সঙ্গে পান এবং পান-মশলার অনেক বিবর্তন ঘটে সেখানে। মুফতিগঞ্জের এক বেগম সাহিবা নাকি এমন কিমামগুলি তৈরি করেছিলেন যে, এক রতি খেলে তামাকের স্বাদের সঙ্গে সুগন্ধ দিনভর মুখে লেগে থাকে। আসগর আলি মুহম্মদ আলির কারখানার সেই কিমামগুলির যশ ছিল সারা দেশে। পরবর্তী কালে মুনশি সৈয়দ এহামদ হুসেন তামাক এবং পান মশলায় আরও বৈচিত্র্য আনেন। কিন্তু উনিশ শতকেই তামাক ছাড়াও চুন সুপারি এলাচ খয়ের সবই নাকি স্বাদে স্বতন্ত্র। লক্ষ্ণৌর পানরসিকদের জন্য সাধারণ পানকে যে কতভাবে সেবাযত্ন করা হত না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না। মাসের পর মাস পানকে মাটি চাপা দিয়ে তৈরি হত বেগম পান। চুনেরও বলতে গেলে গবেষণাগার ছিল। ওদিকে মাহমুদ নগরের কাজি মুহম্মদ ইউনিস নাকি খয়েরের চেহারা চরিত্রই পাল্টে দিয়েছিলেন। আর এলাচ? 'শরর' লিখেছেন—"একটা এলাচ খেয়ে নিন, মুখ পানের চেয়েও লাল হয়ে যাবে।....আর এক ধরনের এলাচ তৈরি হয়েছিল যার মধ্যে 'মিসসি' ভরে দেওয়া হয়। মিসি ডলতে হয় অনেকক্ষণ। স্ত্রীলোকেরা এর একটা এলাচ পানে ভরে খেয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে মিসি লেগে যায়, দাঁতের ফাঁকে খুব গাঢ় নীল দাগ জমে বসে।" আতরেও লক্ষ্ণৌর সুনাম। গোলাব, খাস, মোতিয়া, চামেলি—কত রকমের আতরই না তৈরি হয় এখানে! তার ওপর চকের আসগর আলি বের করেছেন রক্তের মতো লাল আর এক আতর—'হিনা'। কবিরা পাগল তার নামে। লক্ষ্ণৌর কাব্যে

সে-বস্তু প্রতীকের মতো। এক একজনের কলমে তার এক এক অর্থ, নব নব দ্যোতনা।

লক্ষ্ণৌর আতরের মতোই রঙিন সেখানকার 'চক।' ১৮৪৩ সনে লক্ষ্ণৌর চকের বর্ণনা দিচ্ছেন জার্মান পর্যটক ফন ওরলিখ (Von Orlich) : ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মাথায় কারও কাপড় নেই। সবার মাথা ভর্তি কালো চুল। বিনুনি নেমে গেছে পিঠ বেয়ে কোমরের দিকে। ফাঁকে ফাঁকে জড়োয়ার ঝিকিমিকি। প্রায় সকলেরই নাকে নথ। মুখের এক কোণে তা ঝুলে আছে। কানের দুল প্রায় কাঁধ ছুঁই-ছুঁই। ওদের মধ্যে খুব কমই যথার্থ সুন্দরী আছে। কিন্তু প্রত্যেকের দৃষ্টি মর্মভেদী। কাজলের রেখা তাদের চোখগুলোকে আরও আয়ত, আরও কালো এবং টলটলে করে তুলেছে। আলতোভাবে একটি রঙিন কাপড় দুই কাঁধের ওপরে রাখা। তা যত না গোপন করছে, তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে তুলছে। ওরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছে না।কখনও খিল খিল হাসছে, কখনও রসিকতা করছে।...অতি-সতর্ক পরদেশী বলছেন—এদের দিকে মনোযোগ না দেওয়াই ভাল।

তিনি জানেন না, কী অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। মাথায় সিঁথি, চিরুনি চালিয়ে লম্বা চুল দু'পাশে পাটি জমানো। তার ওপর কারুকাজ-করা ক্রমশ সরু হয়ে আসা টুপি। মুখে পান, ঠোঁটে লাক্ষা। অঙ্গে চুস্ত আংগরাখা, নীচে গুলবদনের টাইট রেশমি ঘুটন্না, হাতে মেহেদি, পায়ে টাটবাফি বুট। শীতে আংরাখার বদলে নীল, হলুদ, অথবা সবুজ আলতস, কিংবা বাহারি কাশ্মীরি শাল। এই পোশাকে সেজেগুজে সন্ধ্যায় লক্ষ্ণৌর রইস যখন চকের দিকে পা বাড়ান তখন তিনি নিছক প্রেমবিলাসী নন, লক্ষ্ণৌ-সংস্কৃতিরই একজন রসিক। এধরনের কিছু রসিকের কাহিনী রয়েছে মির্জা মোহম্মদ হাদি রৌসার বিখ্যাত পুঁথি 'উমরাও জান আদা'র পাতায়। বইটি যদিও উপন্যাস, তবু ইতিহাস পাঠক মানবেন কি ফৈজাবাদ, কি লক্ষ্ণৌ—নাগরিক জীবনের পটভূমি এবং পরিবেশ রীতিমত বাস্তব। উমরাও জান ওয়াজিদ আলি শাহর আমলেই চকের গায়িকা এবং নর্তকী। ধনী, রূপবান, কেতাদুরস্ত নবাব সুলতান সাহেব, রুচিবান মেজাজি এবং অভিমানী নবাব ছাব্বান, বাঈজি-তনয় গৌহর মির্জা, দুর্বিনীত রসিদ আলি, আইনজীবী আকবর আলি খান, ধর্মশীল মৌলভি, সত্তর বছরের বৃদ্ধ নবাব—চকে যাঁদের আনাগোনা, তাঁরা সেদিনে লক্ষ্ণৌ সমাজেরই প্রতিভূ। উমরাও জানও তা-ই। সে নিছক বারবনিতা নয়। 'আদা' ছদ্মনামে নিজে সে 'শায়েরি' লেখে, গান বাঁধে ; নাচে। যারা নিজেরা লিখতে জানে না তারা অন্যের লেখা 'শায়েরি' আওড়ায়, গায়। তাদের নূপুর নিক্কণে লক্ষ্ণৌ ঝংকৃত।

যৌনতাও অবশ্যই ছিল। পৃথিবীর কোন শহরই বা মুক্ত তার থেকে ? লক্ষ্ণৌ সম্পর্কে বলা হয় হাজার হাজার বারবনিতা ছাড়াও সেখানে অন্য ধরনের আয়োজন

ছিল। ১৮৫৫ সনে, অর্থাৎ ওয়াজিদ আলি লক্ষ্ণৌ ছাড়ার আগের বছর একজন পত্রলেখক 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন—'ওয়াজ গোমরা ওয়ারস ?' তিনি লিখেছিলেন লক্ষ্ণৌয় গিয়ে তিনি শুনেছেন সেখানে এমন একশ' প্রমোদ-কুঠি রয়েছে যার বাসিন্দা রমণী নয়, এক ধরনের প্রমোদ পুরুষ। সরকারি খাতায় তাদের নাম রয়েছে, সরকার তাদের কাছ থেকে করও আদায় করেন। তা-ই তাঁর মনে পড়েছে বাইবেল-বর্ণিত অনাচারের দেশ গোমরার (Gomorrha) কথা। ১৮৪৮-৪৯ সনে ইঙ্গিতে একই অভিযোগ করেছিলেন লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ লিকি। তাঁর মতেও লক্ষ্ণৌর এক ব্যাধি সমকামিতা। নবাবি-লক্ষ্ণৌয় এই রুচিবিকারের প্রেরণা ছিলেন নাকি স্বয়ং নবাব আসফউদ্দৌলা। তবু এ ধরনের বিকৃতিকে ব্যতিক্রম বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত। যদি নাগরিকার পৃষ্ঠপোষণাকে বিকারের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয় তবে লক্ষ্ণৌ নিশ্চয়ই সে পাপে পাপী। তবে আগেই বলেছি লক্ষ্ণৌর নগর সংস্কৃতির সেটাও এক বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ।

'শরর্' লিখেছেন তিন ধরনের বারবনিতা ছিল লক্ষ্ণৌয়। এক—কাঞ্চনী। শহরের খ্যাতিমান রূপোপজীবিনী তারাই। দ্বিতীয়—চুনেওয়ালি। তৃতীয়—নাগরনি। তবে সব দলেই ছিল নর্তকী এবং গায়িকারা। তিনি লিখেছেন—সুজাউদ্দোলার সময় থেকে আউধে গণিকাদের ভিড়। তারপর থেকে শখের পরিপূর্তি এবং বৈভব দেখানোর জন্য রক্ষিতা রাখা লক্ষ্ণৌয় পরিণত হয় আমীরি আচারে। প্রধানমন্ত্রী হাকিম মেহেদির মতো 'যোগ্য, হুঁশিয়ার এবং শিষ্ট ব্যক্তি'ও নাকি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন পিয়াজু নামে এক বারবনিতার আর্থিক সহযোগিতায়। প্রথম জীবনে মেহেদি যখন কপর্দকহীন তখন পিয়াজু তার সঞ্চিত টাকা তুলে দিয়েছিল প্রেমিক মেহেদির হাতে। সেই থেকে লক্ষ্ণৌর রইস মহলে চলতি কথা—'জব তক ইনসান কো রন্ডিয়োঁ কী সোহ্বত না নসিব হো, আদমি নহি বনতা।' অর্থাৎ, পুরোপুরি মানুষ হতে হলে বেশ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া দরকার। ওয়াজিদ আলি শাহও নাকি তাঁর মন্ত্রী আলি নকি খানকে খুঁজে পেয়েছিলেন কোনও বাঈজির ডেরায়। 'শরর্' লিখেছেন—লক্ষ্ণৌর বন্ধুমণ্ডলীতে যদি কোনও সুন্দরী চোখে পড়ে তবে জেনে রাখবেন সে নিশ্চয়ই কোনও বারবধূ। "এখানে বারবধূদের মর্যাদা এতোখানি ছিল যে, সভ্য সুসংস্কৃত সামন্তদের সঙ্গে একত্রে তারা আসরে গিয়ে বসত। রুচিটা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কিছু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গণিকাও স্বগৃহে এইরকম সম্মেলনের আয়োজন করত, এবং ভদ্রশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সেখানে যেতে কোন লজ্জা সঙ্কোচ হত না। লখনউয়ের চৌধুরাইন বী হায়দর জান এবং ওই স্তরের গণিকাদের বাড়ি ছিল প্রথম শ্রেণীর 'ক্লাব', যেখানে শরিফরা আসতেন যেতেন, সেখানে বিবি সাহিবার তরফ থেকে হুঁকো-পান দিয়ে খুব খাতির করা হত।" এই সব মজলিস যে

কখনও কখনও পরিণত হত সুরেলা শের-শায়েরির আসরে তার আভাস মেলে 'উমরাও জান'-এর পাতায়। 'শরর্'ও স্বীকার করেছেন ব্যাপক নাচগান কাব্যচর্চা লক্ষ্ণৌয় বিফলে যায়নি। "অধিকাংশ শহরে সেইসব লোকই সংখ্যাগুরু যারা, কবিতাই সঠিক পড়তে পারে না। এখানে তার বিপরীত। এখানে এমন একজন মুর্খও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে যথাযত আবেগ দিয়ে কবিতা পড়তে পারে না। অর্থাৎ, এখানকার বাচ্চাদেরও রক্তে-মজ্জায়-শিরায় লয়দারী ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কখনও কখনও রাস্তায় ছেলেরাও ভৈরবী সোহনী বেহাগ বা অন্য কোন সুর এতো সুন্দরভাবে গাইতে থাকে, শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যায়, বড় বড় গায়কেরাও ঈর্ষা করে তাদের।"

এই লক্ষ্ণৌই ছেড়ে এসেছেন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। নাচ গান কবিতায় লক্ষ্ণৌ যেন ইন্দ্রসভা। তামাম ভারতের গাইয়ে বাজিয়েদের আড্ডা লক্ষ্ণৌ। এ শহরে যত রাজ্যের বাইজি আর নর্তকীর ভিড়। গজল। ঠুমরি। কত্থক। তার পরও আমোদের অফুরন্ত আয়োজন। প্রতি খানদানি ঘরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নৃত্যপটীয়সী ডোমকন্যারা। কাশ্মীরের তরুণেরা এখানে রমণীর বেশে নাচে। নানা রঙ্গ তাদের ঘিরে। ওদিকে নিয়মিত মাইফেল, নয়তো শোভাযাত্রা। মহরম কিংবা নওরোজ তো বলতে গেলে মহোৎসব। তারপর আছে যোগিয়া-উৎসব। লক্ষ্ণৌর আনন্দমেলায় এই উৎসর ওয়াজিদ আলি শাহরই সংযোজন। গেরুয়া পরে তিনি যোগী সাজতেন, তাঁর 'পরি'-রা যোগিনী। শহরে সে কী উন্মাদনা!

কবিতা নিয়েও সমান পাগল লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ সুবর্ণযুগের দিল্লিরই প্রতিচ্ছবি। তার চোখে দিল্লির স্বপ্ন। মুঘল রাজধানীতে রোশন চৌকি যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, ঝাড়লণ্ঠনের আলো নিবু নিবু, তখনই একে একে দীপমালা জ্বলে উঠছিল গোমতীতীরের এই শহরে। ফলে জ্ঞানী গুণী, কবি নর্তকী, শিল্পী চিত্রকর সবাই পতঙ্গের মতো ঝাঁক বেঁধে ছুটেছিলেন লক্ষ্ণৌর দিকে। লক্ষ্ণৌ দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিয়েছিল তাঁদের। লক্ষ্ণৌর স্থাপত্যে যদি মুঘলদের গৌরবকালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারে তবে তার জন্য লক্ষ্ণৌর শাসকদের কার্পণ্য দায়ী নয়, দায়ী—কাল। প্রথমত, লক্ষ্ণৌর নাগালে পাথর ছিল না, শ্বেতপাথর তো নয়ই। শহরের মতো অট্টালিকা সবই ইট আর চুন-সুরকিতে গড়া। দ্বিতীয়ত, দিল্লি তখন সূর্য অস্ত। একদা যমুনাতীরে যা ফুটেছিল, গোমতীর ধারে তা-ই ফুটিয়ে তোলা কি সম্ভব? দিল্লির দরবারি সংস্কৃতির সব অবদানই হয়তো গৃহীত হয়েছে এখানে। কিন্তু সবই কমবেশি পরিবর্তিত রূপে। সাহিত্য কিংবা কাব্যও ব্যতিক্রম নয় তার।

লক্ষ্ণৌ অন্যতম মুসলিম বিদ্যাপীঠ। আউরঙ্গজেবের আমল থেকেই আরবি ভাষা চর্চার কেন্দ্র ছিল লক্ষ্ণৌ। ওয়াকিবহালরা বলেন হাদিস ছাড়া ইসলামি শাস্ত্রচর্চায়

লক্ষ্ণৌর খ্যাতি তখন দেশে দেশান্তরে। হিরাত, বুখারা, খুরাসান, কাবুল—লক্ষ্ণৌর নামে সবাই সশ্রদ্ধ। ফারসিরও ব্যাপক চর্চা ছিল লক্ষ্ণৌয়। দিল্লির মতো এখানেও দরবারি ভাষা ছিল ফারসি। তবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে লক্ষ্ণৌর বিশেষ অবদান উর্দু ভাষাকে কেন্দ্র করে। এ ভাষার জন্ম লক্ষ্ণৌতে নয়, দিল্লিতে। উর্দু কবিতা লেখার সূত্রপাত দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে তার সস্নেহ লালনা। সুজাউদ্দৌলার কালে আউধে এসেছিলেন বিখ্যাত উর্দু কবি খান আরসুর। তিনি এখানকার মাটিতেও দেহরক্ষা করেন। তাঁর পর এলেন আসরফ খাঁ 'ফুগাঁ'। তিনি ছিলেন সুজাউদ্দৌলার সভাকবি। তার পর থেকে যে কবি এবং কলাকারই এদিকে আসছেন, পা মুড়িয়ে বসে যাচ্ছেন, লক্ষ্ণৌর সাজানো আসরে। মির্জা রফি 'সদ্যা', মির তকি 'মির'; মুহম্মদ মির 'স্যয়'—অনেকেই সেদিন দিল্লি ছেড়ে লক্ষ্ণৌর পথিক। উর্দু সাহিত্যের এক পর্যায়ে অন্তত কুড়িজন প্রথম সারির কবি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মির্জা জাফর আলি 'হসরত', মির হায়দর আলি 'হ্যয়রন', খোজা হাসান 'হসন'-এর মতো খ্যাতিমানরাও। তারপর এলেন 'যুরঅত' সৈয়দ ইনশা, 'মুসহদি' কতিল, রংগিন—প্রভৃতি কবিরাও খ্যাতিবৃদ্ধি করেছেন লক্ষ্ণৌর।

পুরানো 'মুহারিবা'র (প্রবচন) বদলে 'নাসখ' এবং 'আতিশ' থেকে কাব্যে যখন এসেছে নতুন শৈলী, লক্ষ্ণৌ তখনও উপহার দিয়ে চলেছে নবযুগের কবি : ও অবির, থিয়া রিদ গোয়া বকশ, নসিম দেহ লভি এবং আরও অনেকে। তারপর আমির 'দাগ', মুনির তসলিম ময়রুহ, জালাল লাতাফত, আফজল হকিম প্রভৃতি। 'শরর্' লিখেছেন—"অচিরেই 'শের' বলা লখনউয়ের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কবিদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল গণনার অতীত—অন্য কোনও ভাষায় বোধহয় এরকম দেখা যায় না। মহিলা-মহলেও শের-শাইরীর চর্চা হতে লাগল। এমন কি অশিক্ষিতদের কথাবার্তায়ও কাব্যিক ভাব ও উপমা এবং অলঙ্কারের ঝলক দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।"

শুধু কবি নয়, হাতে-লেখা পুঁথির শিল্পীদের সমান খাতির লক্ষ্ণৌয়। লক্ষ্ণৌয় ছাপাখানা আমদানি করেন আর্সালি নামে এক বিদেশি, গাজিউদ্দিন হায়দরের শাসনকালে (১৮১৪-২৭)। তার আগে তো বটেই, পরেও 'খুশনবিস' লক্ষ্ণৌয় সম্মানের পেশা। 'খুশনবিস' বা পুঁথি-লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নাম ছিল হাফিজ নুরুল্লা এবং হাফিজ ইব্রাহিমের। নবাব সাদত আলি একবার নাকি নুরুল্লাকে 'গুলিস্তা' নকল করে দিতে বলেছিলেন। নুরুল্লা নবাবের কাছে চাইলেন—আশি গাড়ি কাগজ, একশ কলমতরাশ ছুরি, গাড়ি গাড়ি 'নরকট' বা খাগ! চাহিদা দেখে আন্দাজ করা যায় কেমন মেজাজি পুঁথিলেখক ছিলেন তিনি। কারও কারও হাতে লেখা পুঁথি মোতির দামে বিক্রি হত। পাকা লিখিয়ের হাতের কাজ বিক্রি হত অক্ষর পিছু একটাকা দরে! ছাপাখানার-যুগেও

অব্যাহত ছিল লক্ষ্ণৌর পুঁথি লেখকদের এই খাতির। তাঁদের লেখার আদলে ছাপা বলেই লক্ষ্ণৌর মুদ্রিত বইয়ের কদর তখন সারা দেশে। লক্ষ্ণৌ অতএব কেবলই নাচগান হল্লার শহর নয়।

কবিতার কথায়ই ফেরা যাক। উর্দু গদ্যেও অনেক বাহাদুরি দেখিয়েছে লক্ষ্ণৌ। 'শরর্' লিখেছেন—লক্ষ্ণৌয়ে যেদিন প্রথম মির্জা রজন আলি বেগ 'সুরুর' তাঁর 'ফসানা-এ-অজায়ব' প্রকাশ করেন সেদিনই উর্দু গদ্য রচনার শুরু। তবে গদ্যের চেয়েও পদ্যে যেন তার দেয় বেশি। 'মসনবি', 'নয্‌ম' (কবিতা কণা), 'মার্সিয়া' (শোকগীতি)—সব কিছুতেই লক্ষ্ণৌ তুলনারহিত।বলতে গেলে লক্ষ্ণৌর মাইফেলেই নাকি 'মার্সিয়া'র চরম বিকাশ। শোকগীতিতে লক্ষ্ণৌর আর এক কৃতিত্ব 'সোযখোআনি'। প্রেমপ্রণয়ের কাব্যিক অভিব্যক্তি 'ও আসোখত'-এর সূচনা এবং বিকাশ এই লক্ষ্ণৌয়েই। নাটকের জন্মস্থানও এই শহর। ওয়াজিদ আলি শাহ যেদিন 'ইন্দর সভা'র আয়োজন করেন সেদিনই তার মহৎ সূচনা। তা ছাড়া 'রেখতা'র পাশাপাশি 'রেখতি' মেয়েলি ভাষায় পদ্য লেখার রীতিও চালু করেন লক্ষ্ণৌর কবিরাই। এখানেই শেষ নয়। ওয়াজিদ আলির লক্ষ্ণৌয় আরও বিচিত্র সব কবি দল ছিল। একদল কবি ছিলেন যাঁদের বলা হত 'দাস্তান গো', বাংলার দাঁড়াকবির স্টাইলে তাঁরা পদ্যের লড়াই চালাতেন। সামাজিক আমোদপ্রমোদ তথা বিনোদনের আর এক উপকরণ ছিল 'ফাবতি', ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তি বা কালকে স্পষ্ট করে তোলার খেলা। ছিল—'যিলা' (ছন্দবদ্ধ ব্যঙ্গোক্তি), 'ডান্ডেওয়ালা' (কাঠি বাজিয়ে পদ্যে বিগতযুগের ঘটনাবলির বর্ণনা), এবং 'তুকবন্দী',—তুক মিলিয়ে ছন্দে কথার লড়াই। 'শরর্' লিখেছেন—"কবিতা ও সাহিত্যগুণ লোকেদের রক্তে মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। অতি-সাধারণ যে, সেও অল্প লেখাপড়া শিখেই কবিতা-চর্চা আরম্ভ করত। মূর্খ, নিম্নশ্রেণীর লোক এবং অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও কবিভাব এবং শৈল্পিক কোমলতা লক্ষণীয় হয়ে উঠল। লেখাপড়া-না-জানা কবড়িয়ার মধ্যেও কবিত্ব ছিল। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাষা এত শিষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত ছিল, লেখাপড়া-জানা লোক অবাক মানত এদের সংলাপ শুনে। কেউ কল্পনাই করতে পারত না, বক্তা পড়াশোনার ধার দিয়েও যায়নি! এবং ফেরীওয়ালার হাঁকও এমন অলংকৃত, কাব্যময় ও উক্তি বৈচিত্র্যে ভরা ছিল, অন্যরা বুঝতেই পারত না—আসলে কী বলছে!"

তবে রসিকেরা বলেন, লক্ষ্ণৌর কাব্যে চটুলতা বেশি, অনুপাতে গভীরতা কম। এখানে অলীক ইন্দ্রধনুর ছটা, অর্থহীন, রঙের সমারোহ। বৃদ্ধ কবি 'মির' আক্ষেপ করে বলেছিলেন—এক মৃত দিল্লি দশ লক্ষ্ণৌর সমান, এখানে এসে অশ্রু বিসর্জন না করে আমার উচিত ছিল দিল্লিতেই চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়া। সেদিনের দিল্লির কাব্যে যদি

অস্তকালের বেদনার ছায়া, সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় টলমল করছে অশ্রুকণা, লক্ষ্ণৌর কবিতায় তবে মেকি জীবনের জয়গান, কেবলই ফেনিল উচ্ছ্বাস। এ শহরে মানুষ যেন কেবলই হাসে, কাঁদতে জানে না। প্রথম কাঁদালেন বুঝি শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। 'যব ছোড় চলি লখনউ নগরী/ কহ্ হাল আদম প্যারে কা গুজারি...' গাইতে গাইতে তিনি ছেড়ে এসেছেন তাঁর আপন শহর।

ওয়াজিদ আলি লক্ষ্ণৌ ছেড়েছিলেন মার্চের ১৩ তারিখে (১৮৫৬)। রাজত্বে যবনিকাপাত ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে। দুপুরে। আক্ষরিক অর্থেই মধ্যাহ্ন অন্ধকার। তারপর থেকে মাঝখানের দিনগুলো গেছে প্রস্তুতিতে। লক্ষ্ণৌয় কোম্পানির প্রতিনিধি রেসিডেন্ট সাহেবকে তিনি জানালেন লাটবাহাদুর এবং কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে সওয়াল করার জন্য তিনি কলকাতা যেতে চান। দরকার হলে সেখান থেকে যাবেন লন্ডনে, রানির কাছে আর্জি পেশ করবেন। তাঁর রাজত্ব এবং সিংহাসন ফেরত চাইবেন। তিনি লক্ষ্ণৌ ত্যাগের জন্য ছাড়পত্র চান। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য কলকাতায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে দরবার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। গদিচ্যুত 'বাদশা'র কথা কানে তুলতে কেউ রাজি নন। শেষ পর্যন্ত তাই স্থির করলেন, নিজেই যাবেন ইংরাজের রাজধানীতে। অবশেষে অনুমতিও মিলল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়ে দিলেন কলকাতার কাউন্সিল তাঁর সওয়াল শুনতে সম্মত নন। তবে ইচ্ছে করলে তিনি কলকাতা যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে সেখানে বাসও করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে ইচ্ছেমত লোকজন নিয়ে যাওয়া চলবে না। ভূতপূর্ব 'বাদশা'র সহযাত্রী হতে পারে বড়জোর শ' পাঁচেক লোক। ওয়াজিদ আলি তাতেই সম্মত হলেন। আসফউদ্দৌলা যখন শিকারে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকত দশ হাজার পদাতিক, হাজার অশ্বারোহী, দেড়শ' কামান। সেই সঙ্গে দেড় হাজার হাতি, তিন হাজার গরু এবং ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। ঢাকা-গাড়িতে হারেমের মেয়েরা। তারা ছাড়া থাকত নর্তকী এবং গায়িকা। তা ছাড়া শিকারি চিতা, বাজ এবং লড়িয়ে মোরগ পায়রা ইত্যাদি। ওয়াজিদ আলি এসব সমারোহের কথা

জানেন। নবাবি বিলাসের সঙ্গে তাঁরও আবাল্য পরিচয়। তবু মাত্র শ' পাঁচেক সহযাত্রী নিয়েই তিনি কলকাতা যাত্রায় রাজি হলেন। তা ছাড়া উপায় কী? দেখাই যাক না একবার শেষ চেষ্টা করে। এক ঘোষণা প্রচার করে তিনি প্রজাদের নির্দেশ দিলেন ইংরাজ সরকারকে মান্য করে চলতে। তাদের প্রতি দুর্বিনীত আচরণ না-করতে। ঠিক মতো রাজসরকারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে। যতক্ষণ না তিনি কলকাতা কিংবা লন্ডনে গিয়ে এই মামলার ফয়সালা না করে আসছেন ততক্ষণ প্রজারা ইংরাজ-হুকুম মেনেই চলুক, এই ছিল তাঁর পরামর্শ।

যাত্রার প্রস্তুতিপর্বের কিছু বিবরণ আছে এলু জানের কাহিনীতে। এলু জান ছেলেবেলা থেকেই নবার পরিবারের হারেমের বাসিন্দা। সে ছিল নবাব আমজাদ আলির প্রধান বেগম, ওয়াজিদ আলির মা বেগম আউলিয়ার পরিচারিকা। বেগমের হুঁকো সাজাত সে, পায়ে তেল মাখিয়ে দিত। ফলে হারেম এবং দরবারের অনেক ঘটনার সে প্রত্যক্ষদর্শী। বেগম তার বিয়েও দিয়েছিলেন একটি যুবকের সঙ্গে। তার একটি ছোট্ট দোকান ছিল। ওয়াজিদ আলি এবং তাঁর জননীর সঙ্গে ওরা কলকাতায়ও এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে যায় লক্ষ্ণৌয়। সেখানে জোহানেস নামে এক বিদেশি সওদাগরের বাড়িতে কাজ নেয়। তারপর আর একজনের কাছে। তিনিই সংকলন করেছিলেন এলু জানের কাহিনী। সেই বিদেশিকে এলু জান বলে—বেগম, অর্থাৎ ওয়াজিদ আলির মা সেদিন স্নানের পর প্রসাধন করছিলেন। এমন সময় একটি সিল-করা বড় খাম আনা হল তাঁর কাছে। বলা হল—জরুরি চিঠি। উজির এটি পাঠিয়েছেন। বেগম চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি 'রাজ্য শেষ হয়ে গেল' বলতে বলতে পায়ে জুতো না পরেই ছুটলেন। উঠোনের পর দৌলতখানা। তারপরই নবাবের মহল। বেগম সেদিকে ছুটলেন। আমরা কেউ তাঁর চাদর, কেউ ওড়না, কেউ ছাতা, কেউ জুতো নিয়ে ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। আমরা এক একজন তাঁকে এক একটা পরাতে যাই আর তিনি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন—না, না, আমাকে পরিচারিকা ছাড়াই চলতে হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যখন সিংহাসন ছাড়া চলতে হবে তখন হয়তো আমার ঘরও থাকবে না, খাওয়াও জুটবে না। বেগমের চোখে জল। আমরাও কাঁদতে লাগলাম।

বেগম কোনও খবর না পাঠিয়ে কোনও আচার অনুষ্ঠান পালন না-করেই সোজাসুজি ঢুকে গেলেন সেই ঘরে যেখানে তাঁর ছেলে বসে আছেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। সবাই সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল। সবাই নিস্তব্ধ। সবাই হতভম্ব।

'বাদশা' একা বসেছিলেন। তিনিও কাঁদছিলেন। মাকে দেখে তিনি দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। বেগম তিনবার সেলাম করে তাঁর সামনে

গিয়ে বললেন—কী, এবার তোমার শখ মিটল তো ? শেষ পর্যন্ত তোমার নাচ গান এবং বাজনার প্রতিদান পেলে তো ? তোমাকে কি আমি বলিনি যে এই নিয়তিই অপেক্ষা করে আছে ? তোমার পূর্বপুরুষরা কি কেউ কখনও জেনানার সাজে নেচেছেন ? 'বাদশা' জবাবে একটা কথাও বললেন না।

এলু জান বলছে—রাজ্যের বড় বড় লোকেরা এসে 'বাদশা'কে বললেন—আমরা সৈন্য দিচ্ছি, গোলাবারুদ দিচ্ছি, ইংরাজের সঙ্গে লড়ে যান। বিদ্রোহ করুন। 'বাদশা' রাজি হলেন না। তাঁরা বেগমের কাছেও এলেন। তিনি প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার জন্য এক রাত্তির সময় চাইলেন। বাহারান্নিসা নামে তাঁর একজন প্রিয় পরিচারিকা ছিল। বেগম তার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পরদিন লড়াইয়ের প্রস্তাব তিনিও নাকচ করে দিলেন। সেদিনই তিনি আমাদের কাছে ইংল্যান্ড যাত্রার সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। বললেন—আমি ইংরাজ-রানির কাছে যাব। তাঁরও পুত্রসন্তান রয়েছে, বেগম বললেন—তাঁকে অমি বলব আমার ছেলের মাথা থেকে তাজ কেড়ে না নিতে। তাঁর কি মুকুট নেই, রাজত্ব নেই, যথেষ্ট ধনদৌলত নেই ? সারা দুনিয়াই কি তাঁর চাই ? আমরা বললাম—কী করে আপনি যাবেন ? আপনি নদী দেখলেই ভয় পান, সীমাহীন সমুদ্র, বিশাল কালাপানি পার হবেন কেমন করে ? কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের কথা শুনতে রাজি হলেন না। বেগম যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

সেই প্রস্তুতিরও কিছু বিবরণ দিয়েছে এলু জান। হারেমে একটা বিরাট চৌবাচ্চা ছিল। সেটার জল ফেলে দিয়ে তার তলায় মাটির নীচে তৈরি হল এক চোরাকুঠরি। বেগম তার মধ্যে সোনা রুপোর আসবাবপত্র, এবং যেসব গয়নাগাটি তিনি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছেন সেগুলো বাদ দিয়ে সব মণিমুক্তো তার মধ্যে জড়ো করলেন। তারপর মাদুর, অয়েলক্লথ, এ সব ঢেকে তার ওপর গড়ে তোলা হল ছাদ। ছাদের ওপর তেমনই রইল চৌবাচ্চা। তাতে জল ভরা হল। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না তার তলায় কী রয়েছে।

এলু জান বলছে—প্রস্তুতি শেষ। বেগম তৈরি হলেন ইংল্যান্ড যাত্রার জন্য। বেগমের সঙ্গে রইল বাহারান্নিসা, আমি এবং আর কয়েকজন পরিচারিকা। হারেমের অন্যদের অনেককে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। কারও কারও জন্য ব্যবস্থা হল পেনসনের। বেগম যাত্রাপথের জন্য প্রচুর পানীয় জল নিলেন তাঁর সঙ্গে। এলু জান ভেবে পায় না তার কী প্রয়োজন ছিল,—পথে তো জলের কোনও অভাব নেই !

ওদিকে পুত্র ওয়াজিদ আলি শাহও তৈরি। অবশেষে লক্ষ্ণৌর বাদশাহি উদ্বাস্তুদের বিষণ্ণ মনে যাত্রা। সকালে একটা খোলা গাড়িতে চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন আউধের শেষ 'বাদশা' ওয়াজিদ আলি শাহ। প্রজারা অবশ্য তাঁকে নবাব বলেই জানে

এবং মানে। নবাবের গাড়ির পিছনে সার সার গাড়ি। ঘোড়ায় টানা গাড়ি সব। ঢাকা দেওয়া গাড়িগুলোতে রয়েছেন বেগমরা, আর তাঁদের পরিচারিকারা। তারপর অন্য অনুচর সহচরের দল। নবাবের সঙ্গে গাড়িতে রয়েছেন একপাশে রাজা ইয়সুফ আলি, অন্যদিকে মিঃ ব্রান্ডন।

এই ইংরাজ সহযাত্রীটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে লক্ষ্ণৌর দরবারের সঙ্গে বিদেশিদের অন্তরঙ্গতার কাহিনী বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিদেশি বলতে রেসিডেন্সি কিংবা কোম্পানির সামরিক অসামরিক প্রতিনিধিদের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে সেই সব পরদেশিদের কথা যাঁরা কোম্পানির মাইনে ভোগী আমলা নন, যাঁরা নবাবদের অনুগত এবং আশ্রিত। ১৭৭৫ সনে কোম্পানির সঙ্গে নবাবের যখন চুক্তি হয় তখন বলা হয়েছিল নবাব কোম্পানির অনুমতি ছাড়া কোনও ইউরোপিয়ানকে কোনও কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন না। বিশেষ করে সামরিক বিভাগে কোনও ইউরোপীয়কে নিয়োগ করার ব্যাপারে কোম্পানি কিছুতেই অনুমতি দিতে চাইত না। ১৮২০ সনে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারসও নির্দেশ দিয়েছিলেন—নবাবের বাহিনীতে যেন কোনও ইউরোপীয় কিংবা ভারতে জাত ব্রিটিশ প্রজা, অথবা ব্রিটিশ বাবা এবং ভারতীয় মায়ের সন্তানেরা অনুপ্রবেশ না করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখা চাই। ১৮২৪ সনে নতুন নির্দেশ—যেন কোনও ইউরোপীয়ই নবাবের কাছে খাতির না পায়। সুতরাং কলকাতার কর্তৃপক্ষ কিছুতেই নবাবের বাহিনীতে ইউরোপীয় অফিসার নিয়োগে অনুমতি দিতেন না। 'ইউরোপীয়' বলতে তখন ইউরোপীয় বাবা এবং ইউরেশিয় বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মায়ের সন্তানদেরও বোঝাত। কিন্তু মা এদেশীয় মহিলা হলে তবে আর তাঁদের 'ইউরোপীয়' বলে গণ্য করা হত না। তখন 'অসবর্ণ' বিয়েতে ইংরাজদের আপত্তি নেই। ফলে সমাজে এ-ধরনের সন্তানও অনেক। ব্রিটিশ বাহিনীতে তাঁদের ঠাঁই ছিল না। ১৮৩৩ সনের সনদের আগে কোম্পানির সেনাদল নৌবাহিনী এবং অসামরিক কাজে তাঁদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ফলে তাঁদের অনেকেই ঝুঁকেছিলেন সেদিন আউধের দিকে। ইংরাজ যখন তাঁদের 'ইউরোপীয়' বলে স্বীকার করে না, তখন আইনের বিধিনিষেধও তাঁদের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না। লক্ষ্ণৌর নবাবরা স্বাগত জানিয়েছিলেন এই বর্ণ-সংকর সম্প্রদায়কে। ১৮৩৭ সনে অতএব রেসিডেন্ট কলকাতার কর্তৃপক্ষকে জানালেন—নবাবের বাহিনীর অন্তত দুটি ব্যাটেলিয়ান ইউরেশিয়ানদের নিয়ে গড়া। তাদের পরিচালনা করেন কোম্পানির ফৌজের ভূতপূর্ব সৈনিক লেফটেনেন্ট কর্নেল অ্যাব্রাহাম রবার্টস এবং তাঁর দিশি-বিবির পুত্র মিঃ ডব্লিউ রবার্টস।

সামরিক বাহিনীতে ইউরোপিয়ানদের নিয়োগে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কড়াকড়ি করলেও অসামরিক নিয়োগের ব্যাপারে তত কড়াকড়ি ছিল না। সাধারণত অনুমতি

মিলত। কোম্পানি আপত্তি তুলেছিল একবারই, ১৮৩১ সনে নাসিরউদ্দিন হায়দর যখন কর্নেল উইলিয়াম গার্ডনারের ওপর একটি জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। গার্ডনার এক সময় কোম্পানির ফৌজে ছিলেন। সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি দিল্লির কাছে খাসগড়ে তাঁর মুসলিম বিবিকে নিয়ে বাস করতেন। লক্ষ্ণৌয় তাঁর ব্যবসা ছিল। সুতরাং, মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন। সেই সূত্রেই নবাবের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় এবং ক্রমে বন্ধুত্ব। তাঁর ছেলে জেমসও বিয়ে করেছিলেন এদেশের এক খানদানি পরিবারে। কোম্পানি তাঁর বেলায় অনুমতি না দিলেও অন্যদের ক্ষেত্রে যে আপত্তি পেতে অসুবিধা হয়নি নাসিরউদ্দিন হায়দরের দরবারে বিদেশি ভাগ্যান্বেষীদের ভিড়ের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

আউধে বিদেশিদের এই খাতির শুরু হয়েছিল সেই নবাব সুজাউদ্দৌলার কালে। আসফউদ্দৌলার লক্ষ্ণৌ যেন পরদেশি ভাগ্যান্বেষীদের কাছেও স্বর্গ। ১৭৭১ সনে শিল্পী টিলি কেটল ছিলেন ফৈজাবাদে সুজাউদ্দৌলার দরবারে। ব্যাপ্টিস্ত জোসেফ জেন্টিল (Baptiste Joseph Gentil) নামে এক ফরাসি ভাগ্যান্বেষী ও অ্যান্টনি পোলিয়ার নামে এক ইঙ্গ-সুইস স্থপতিও তখন সেখানে। তারপর লক্ষ্ণৌয় এলেন বিখ্যাত ইংরাজ শিল্পী জোফানি। বস্তুত সেকালে যে সব ইউরোপীয় চিত্র শিল্পী কলকাতায় আসতেন তাঁদের প্রায় সকলেই একবার টুঁ দিতেন লক্ষ্ণৌয়। কেননা, সেখানে নবাবদের পৃষ্ঠপোষণা লাভের সম্ভাবনা। জোফানি অনেক ছবি এঁকেছেন লক্ষ্ণৌর দরবার এবং উঁচু মহলের জীবনের। তাঁর আঁকা কর্নেল মরডাউন্টের বাড়িতে (Col. Mordaunt) মোরগের লড়াইয়ের ছবি থেকে সেদিনের অভিযাত্রী ইউরোপীয় এবং তাঁদের এদেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের জীবনের আভাস মেলে। কর্নেল মরডাউন্ট ছিলেন আসফউদ্দৌলার দেহরক্ষী বাহিনীর একজন সেনাপতি। নবাবের মোরগকে হারাবার জন্য তিনি উঁচুজাতের লড়িয়ে মোরগ আমদানি করেছিলেন খাস বিলাত থেকে। সাদত আলির সময় অন্যতম দরবারি চিত্রকর ছিলেন রবার্ট হোম। গাজিউদ্দিন হায়দরের সময়ও লক্ষ্ণৌ ছিলেন তিনি। তারপর বিচি, ক্যাসানোভা, ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি এবং আরও কেউ কেউ। কলকাতার চেয়েও যেন লক্ষ্ণৌর দরবারে পশ্চিমী শিল্পীদের বেশি খাতির।

খাতির অন্য ভাগ্যান্বেষীদেরও। লক্ষ্ণৌ থেকে পাঁচ মাইল দূরে অ্যান্টনি পোলিয়ার তাঁর দিশি বিবি ও ছেলেমেয়ে নিয়ে নবাবের মতো বাস করতেন। চালচলনে তিনিও যেন একজন নবাব। তাঁর নামেই পোলিয়ারগঞ্জ। সেদিনের লক্ষ্ণৌয় আর একজন বিখ্যাত পরদেশি স্বনামধন্য ক্লড মার্টিন (Claude Martin)। তিনিও আর এক নবাব। এই ফরাসি ভাগ্যান্বেষীর জীবন রোমাঞ্চ-উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। তিনি ফরাসিদের বদলে নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করেছিলেন এ দেশে ক্ষমতার লড়াইয়ে

বিজয়ী ইংরাজদের হাতে। ১৭৭৪ সনে কলকাতার কর্তৃপক্ষ তাঁকে আউধ পাঠিয়েছিলেন কিছু এলাকা জরিপের কাজে। পরের বছর তাঁকে নিয়োগ করা হয় নবাবের অস্ত্রশালা তদারকির জন্য। চার বছর পর দেখা গেল মার্টিন কোম্পানির বদলে পুরোপুরি নবাব দরবারের কর্মচারী। দেখতে দেখতে আঙুল ফুলে কলাগাছ। মার্টিন রাতারাতি বিস্তর ধনসম্পত্তির অধিকারী। নবাবের বদান্যতায় তাঁর হাতে প্রচুর জমিজমা। নগদ অর্থেরও অভাব নেই। তিনি একদিকে যেমন দরবারে কাজ করেন, অন্যদিকে তেমনই নানা ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করছেন। তা ছাড়া তিনি একজন নীল ভুইঞাও বটেন। গোমতীর ধারে 'ফারাদ বখশ' নামক প্রাসাদে তিনি নবাবি চালে বাস করেন। নবাব সে বাড়িটি কিনে নেওয়ার পর নতুন প্রাসাদ গড়েন—'কনস্টান্সিয়া'। তিনি, পোলিয়ার এবং লক্ষ্ণৌয় কোম্পানির পে মাস্টার জেনারেল জন উম্বওয়েল—এই তিন সাহেবের দৌলতে লক্ষ্ণৌ সেদিন রীতিমত বর্ণাঢ্য। এঁরা তিন জন ছাড়াও জন মরডাউন্ট ছিলেন লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির ভক্ত। পোলিয়ার এবং মার্টিন দু'জনই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পুঁথি-সংগ্রহকারী। হাজার হাজার পুঁথি ছিল ওঁদের লাইব্রেরিতে। তা ছাড়া, ছবির সংগ্রহ। ওঁরা প্রায় সবাই দেশীয় বিবি নিয়ে ঘর করতেন। মার্টিনের প্রিয়তম বিবির নাম ছিল বোলন (Boulone)—এক মুসলিম সুন্দরী। ১৮০০ সনে ক্লড মার্টিন যখন মারা যান তখন বিস্তর ভূসম্পত্তি ছাড়াও তিনি নগদ তিন লক্ষ পাউন্ডের মালিক। এই অর্থ কীভাবে খরচ করা হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন তিনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এখনও রয়েছে তাঁর সেই বিখ্যাত উইল। তাঁর অর্থেই লক্ষ্ণৌ এবং কলকাতার দুটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 'লা মার্টিনিয়ের'। বোলন বেঁচে ছিল আরও তিরিশ বছর। লক্ষ্ণৌয় মার্টিনের প্রাসাদের কাছেই রয়েছে তার সমাধি। লোকে বলে—'গোরি বিবি কা মকবারা।'

প্রায় সব নবাবের সঙ্গেই এধরনের কিছু না কিছু বিদেশি অভিযাত্রীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠত। কেউ কেউ দরবারে কাজও পেয়ে যেতেন। নাসিরউদ্দিন হায়দরের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন পুরোপুরি ইংরাজি কেতার ভক্ত। তিনি ইংরাজদের ভঙ্গিতে সুরাপান করতেন। সব সময় ইংরাজের পোশাক পরতেন। শুধু টুপির বদলে মাথায় বাদশাহি তাজ পরতেন, এই যা। ১৮১৮ সনে লর্ড হেস্টিংস লক্ষ্ণৌর দরবারে একজন আইরিশ বাদ্যযন্ত্রশিল্পীর দেখা পেয়েছিলেন। ১৮২৭ সনে জর্জ মান্ডি সেখানে দেখা পেয়েছিলেন একজন ইউরোপীয় কৌতুকাভিনেতার। গাজিউদ্দিন হায়দরের সময় কলকাতা থেকে সঙ্গীতশিল্পী মিঃ লেসি এবং তাঁর স্ত্রী হাজির হয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ দরবারে গান গাইতে। বাদশা তাঁদের দরবারে ঠাঁই দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের গান শুনতে মোটে ভালবাসতেন না। ওয়াজিদ আলি শাহও মারিও নামে একজন

ইউরোপীয়কে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে। কিন্তু তিনিও পশ্চিমী গান শুনতে পছন্দ করতেন না। মারিও পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিলেন যন্ত্রশিল্পীতে। বোঝা যায়, কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক থাকলেও এবং অনেক ইউরোপীয় অভিযাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও লক্ষ্ণৌর দরবারে পশ্চিম মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। লক্ষ্ণৌর সমাজ এবং সংস্কৃতি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। সেই সংস্কৃতির প্রভাবে বরং নিজেদের জীবনধারা পাল্টেছেন পশ্চিমীরাই। লক্ষ্ণৌয় পশ্চিমী হাওয়া বলতে কিছু অট্টালিকা। কিছু কিছু বাড়ির গড়নে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে, এই যা। অথচ, প্রায় প্রত্যেক নবাবের আমলে অন্তত দশ পনেরোজন বিদেশি যুক্ত ছিলেন দরবারের সঙ্গে। ১৮৪৯ সনে, অর্থাৎ ওয়াজিদ আলির সময়ে মাথাগুনতি করে দেখা গিয়েছিল তাঁদের সংখ্যা আটত্রিশ জন।

মিঃ ব্রান্ডেন ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনিও একজন ইংরাজ ভাগ্যান্বেষী। লক্ষ্ণৌ শহরে ব্যবসা ছিল তাঁর। তা ছাড়া দরবারেও যাতায়াত ছিল। সেই সুবাদেই নবাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। রেসিডেন্ট এই বন্ধুত্বকে সুনজরে দেখেননি। কলকাতায় লেখালেখি করে মিঃ ব্রান্ডেনকে তিনি লক্ষ্ণৌ ছাড়তে বাধ্য করেন। ব্রান্ডেন তারপর থেকে কানপুরের বাসিন্দা। সেখান থেকে 'সেন্ট্রাল স্টার' নামে একটি কাগজ বের করতেন তিনি। তিনি ছিলেন ওয়াজিদ আলির একজন অন্ধ ভক্ত। শোনা যায় নবাবকে কলকাতা যাত্রার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই। তা ছাড়া নবাবের আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন সহকারী রেসিডেন্ট মিঃ বার্ড। তাঁকে অবশ্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল দূর আজমিরে। তিনিও পরে শামিল হয়েছিলেন নবাবের দলের সঙ্গে। সে কাহিনী পরে।

নবাবের নাতিদীর্ঘ শোভাযাত্রা যখন শহরের অন্য প্রান্তে মির খোদাবক্সের কারবালায় পৌঁছেছে সেখানে তখন চলেছে জমজমাটি মজলিশ। নবাবও যোগ দিলেন তাতে। এক সময় হঠাৎ গেয়ে উঠলেন বেদনাভরা বিষাদসঙ্গীত—'দারও দিয়াও পার হজরত সে নজর করতে হ্যায়/খুশ রহো আহলে ওয়াতন হাম তো সফর করতে হ্যায়!'—'আমরা বাসনা নিয়ে তাকিয়ে থাকি দেওয়াল আর দরজার দিকে, হে নাগরিকরা তোমরা খুশি থেকো, আমি চললাম সফরে।' শ্রোতারা যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। আনন্দ-আসর পরিণত হল কান্নার সাগরে। কাঁদতে কাঁদতেই লক্ষ্ণৌবাসী বিদায় জানালেন তাঁদের শেষ নবাবকে।

রাত্রে ওঁরা উন্নাও পৌঁছালেন। কিন্তু নবাব এবং তাঁর সহযাত্রীরা সেখানে থামলেন না। রাত শেষ হওয়ার আগেই হাজির হলেন গঙ্গাতীরে। সেখানে তাঁবু ফেলা হল। নবাব নামাজে বসলেন। লোকজন লেগে গেল গঙ্গার ওপর অস্থায়ী সেতু

গড়তে। সেই সেতু দিয়েই নদী পার হয়ে ওঁরা কানপুরে পৌঁছালেন। সেখানে নবাবের জন্য বেশ কয়েকটি বাড়ি আগে থেকেই ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নবাব উঠলেন অনুগত সুহৃদ মিঃ ব্রান্ডনের বাংলোয়। তাঁর সঙ্গীসাথীরা আস্তানা গাড়লেন ভাড়া করা বাড়িগুলোতেই। গণ্যমান্যরা অনেকে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দু'জন বৈমাত্রেয় ভাই এলেন। এলেন কোনও কোনও আমির ওমরাহও। বিশেষত প্রবীণ রাজা জওলাপ্রসাদ। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌর নবাবদের কোষাধ্যক্ষ এবং নবাবি গহনাপত্র ও মণিমাণিক্যের জিম্মাদার। তিনি বললেন—আমিও কলকাতা যেতে চাই। নবাব অনেক কষ্টে নিরস্ত করলেন তাঁকে। বললেন—সেটা ঠিক হবে না। আপনি অতিবৃদ্ধ। বরং এখানে থেকেই হিসামউদ্দৌলাকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন ঠিক মতো তোষাখানা রক্ষা করতে। কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকও এলেন নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। সে দলে ছিলেন সদ্য ব্রিটিশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত পঞ্জাবের চিফ কমিশনার লরেন্স। ওয়াজিদ আলি দেখা করতে সম্মত হলেন না তাঁর সঙ্গে। লরেন্সকে বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল নবাবের শরীর ভাল নেই।

ক'দিন পরে কানপুর থেকে জলপথে এলাহাবাদ। সেখানে দিনকয় বিশ্রাম নিয়েছিলেন তিনি 'পাঁচঘর' নামক একটি বিশাল কুঠিতে। ততদিনে চারদিকে রটে গেছে লক্ষ্ণৌর নবাবের রাজ্য হারাবার খবর। কোম্পানির অপরিমিত লালসার কাহিনী। প্রতিকারের সন্ধানে ওয়াজিদ আলির কলকাতা যাত্রার সংবাদও অগোচরে নেই কারও। বজরা নয়, কানপুর থেকে নবাব এবং তাঁর সঙ্গীরা আসছিলেন একটি ভাড়াকরা স্টিমারে। স্টিমারটি একটি সওদাগরি কোম্পানির। এলাহাবাদের ঘাটে সেটি নোঙর করা মাত্র সেখানে ভিড় জমে গেল। সবাই দেখতে চায় রাজ্যহারা লক্ষ্ণৌর নবাবকে। এখানেও স্থানীয় গণ্যমান্যরা এসে সম্মান জানিয়ে গেলেন নবাবকে। এলাহাবাদ এক সময় আউধের সীমানার মধ্যেই ছিল। লক্ষ্ণৌর নবাবরাই ছিলেন কেল্লাসমেত নগর এবং চারপাশের মুলুকের অধীশ্বর। ওয়াজিদ আলি অতএব সেখানে অজানা দেশের কোনও অচেনা আগন্তুক নন। এলাহাবাদবাসী সাদরে অভ্যর্থনা জানাল তাঁকে। এবং সখেদে। ইংরাজের মুলুকে তারা আর কী করতে পারে ভাগ্যাহত নবাবের জন্য?

সেখানে কয়দিন কাটিয়ে নবাব এলেন বারাণসীতে। কাশীতে তাঁকে স্বাগত জানালেন মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিং। নবাব এবং তাঁর প্রধান বেগমদের জন্য সেরা প্রাসাদটি ছেড়ে দিলেন তিনি। নবাবের সঙ্গীদের জন্যও উদার রাজকীয় আতিথেয়তা, লক্ষ্ণৌর নবাবের জন্য আন্তরিক আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন কাশীরাজ। ওয়াজিদ আলি রাজ্যহারা, এখন তিনি নামেই আউধের বাদশা, ঈশ্বরীপ্রসাদ যেন এ তথ্য স্বীকার করেন না, পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকা নজরানা দিয়ে তিনি নবাবের

কাছে নিবেদন করলেন নিজের আনুগত্য। প্রথা অনুসারে ওয়াজিদ আলি তাঁকে 'খেলাত' দিলেন। রাজা প্রতি-অভিবাদন জানালেন একশ' এক আসরফি দিয়ে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল রাজকীয় সমারোহের মধ্যে। তারপর শুরু হল আবার যাত্রা। ওয়াজিদ আলি শাহ অনেক কিতাব রচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন—একশ' তো হবেই। লক্ষ্ণৌর এক গবেষক জানিয়েছেন তাঁর কাছেই নবাবের লেখা খান পঞ্চাশেক বই রয়েছে। তার মধ্যে ছোট্ট একখানা কিতাবে অতি সংক্ষেপে তাঁর এই কলকাতা যাত্রার কাহিনী শুনিয়েছেন নবাব। বইটির নাম—'হুজনে আখতার।' অর্থাৎ, আখতারের খেদ। 'আখতার' কবি ওয়াজিদ আলির ছদ্মনাম। তাঁর আর একটি ছদ্মনাম ছিল—'সুলতান আলম'। ছোট্ট এই পদ্য-কাহিনীটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৬৬ হিজরিতে, মেটিয়াবুরুজের নবাবি ছাপাখানা 'মতরা-ই-সুলতানি' থেকে। তারপর থেকে অনেক সংস্করণ হয়েছে বইখানার। ১৯২৬ সনে আবদুল ওয়ালি নামে একজন কলকাতা থেকে তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেন। অবশ্য গদ্যে। সে অনুবাদ এখন অপ্রচলিত। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, লক্ষ্ণৌয় এখনও ছাপা হয় এই কিতাব। এ কালেও একটি নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে। সুখের কথা, ওয়াজিদ আলি শাহর আরও কিছু কিছু বইয়ের মর্ম বাংলায়ও অনূদিত। (দ্রষ্টব্য : অযোধ্যার নবাব, প্রবাসী, ১৩৭৪)। তাঁর লেখা সঙ্গীত সংক্রান্ত একখানা মূল্যবান পুঁথিরও সারমর্ম বাংলায় লভ্য। (দ্রষ্টব্য : দেশ, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৭৬)। 'হুজনে আখতার'-এর বয়ান অনুযায়ী নবাব কানপুর থেকে এলাহাবাদে পৌঁছেছিলেন আট দিনে। কাশীতে রাজার প্রাসাদে ছিলেন চৌদ্দ দিন। কাশীরাজ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : মানুষের অবয়বে দেবদূত তিনি!

বেনারসে নবাব এবং তাঁর সঙ্গীরা দু'দলে ভাগ হয়ে যান। 'আখতারের খেদোক্তি'তে অবশ্য সে কথা নেই। অন্য এক বিবরণে বলা হচ্ছে নবাব, তাঁর মা, এবং নবাবের প্রধান বেগম বেনারস থেকে কলকাতা যাত্রা করেন ম্যাকলিয়ড কোম্পানির একটি স্টিমারে। নবাবের সঙ্গীরা রওনা হন বিপুল বিশাল বজরায় এবং অন্য ধরনের নৌকায়। দলের অন্যরা যাত্রা করেন সড়ক পথে। গাড়ি ঘোড়ার সে নাকি বিচিত্র এক শোভাযাত্রা।

উনিশ কুড়িদিন পরে, রমজানের চাঁদ যখন দেখা গেল (৭ রমজান) তখন স্টিমার এসে ভিড়ল কলকাতার ঘাটে। ইংরেজি দিনপঞ্জিতে সেদিন ৬ মে, ১৮৫৬। 'হুজনে আখতার'-এর ইংরাজি অনুবাদক বলছেন মাসটা ছিল এপ্রিল। অনুগত উজির-নাজির আমির ওমরাহ ছাড়াও নবাবের সঙ্গে ছিলেন মা মালকা-ই-কিস্‌রর, ভাই সিকেন্দর হাসমত, যুবরাজ কমর কদ্র এবং পাঁচ ছয় জন বেগম। অন্য বেগমরা তখনও লক্ষ্ণৌয়।

কেউ কেউ বলেন নবাব কলকাতায় নেমে প্রথমে সদলবলে আস্তানা গেড়েছিলেন বেলগাছিয়ায়। তারপর মেটিয়াবুরুজে বর্ধমানের মহারাজার একটি বাগানবাড়িতে। সে বাড়ির ভাড়া ছিল নাকি মাসে দু' হাজার টাকা। কেউ কেউ বলেন—কলকাতায় নবাব প্রথম থেকেই মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা। প্রথমে বাস করতেন সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি সার উইলিয়াম পিল-এর বাড়িতে। আবদুল হলিম 'শরর্' লিখেছেন—মেটিয়াবুরুজে নদীর ধারে দু' আড়াই মাইল দীর্ঘ জমি জুড়ে বেশ কয়েকখানা বাড়ি ছিল। "ওয়াজিদ আলি শাহ্ যখন কলকাতায় পৌঁছালেন গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এই বাড়িগুলি ওঁকে দিলেন। দুটো বাড়ি খাস বাদশাহর জন্য, একটা নবাব খাসমহলের আর একটা আলি নকী খাঁর থাকবার জন্য।"

সরকারের এই উদারতা সম্পর্কে, বলা বাহুল্য সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ধরে নেওয়া ভাল, বাড়ি জমির মোটামুটি বন্দোবস্ত করেই নবাব কলকাতার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। নিশ্চয় তিনি ইংরাজের আতিথেয়তার প্রত্যাশা করেননি। লক্ষ্ণৌ ত্যাগের সময় রেসিডেন্ট তথা চিফ কমিশনার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কোম্পানির এলাকা দিয়ে নির্ভয়ে তিনি কলকাতা যাত্রা করতে পারেন। পথে কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাবেন। যেখানে যেখানে কোম্পানির গোলন্দাজবাহিনী মোতায়েন করা আছে সেখানে তাঁকে সামরিক অভিবাদনও জানানো হবে। লক্ষ্ণৌর বাদশাদের একুশ তোপের সেলাম প্রাপ্য। ভূতপূর্ব 'বাদশা' নিশ্চয় রাজ্য হারাবার পর সেই সম্মান আশা করেননি। কিন্তু পথে সাধারণ সৌজন্য দেখাবার জন্যও কোনও ইংরাজ রাজপুরুষ কোথাও তাঁর সামনে হাজির হননি। কলকাতায় পৌঁছেও একই অভিজ্ঞতা। 'বাদশা' নাকি নিজের খেদ প্রকাশ করেছিলেন গভর্নর জেনারেলের কাছে লেখা এক চিঠিতে। সরকারের তরফে উত্তর মিলেছিল—সরকার বাহাদুর জানতেন না, ঠিক কবে বা কখন তিনি কলকাতা পৌঁছাবেন। জানলে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিনিধি হাজির থাকতেন গঙ্গার ঘাটে!

ওয়াজিদ আলি কি তখনও আশা করেছেন কলকাতায় তিনি সুবিচার পাবেন!
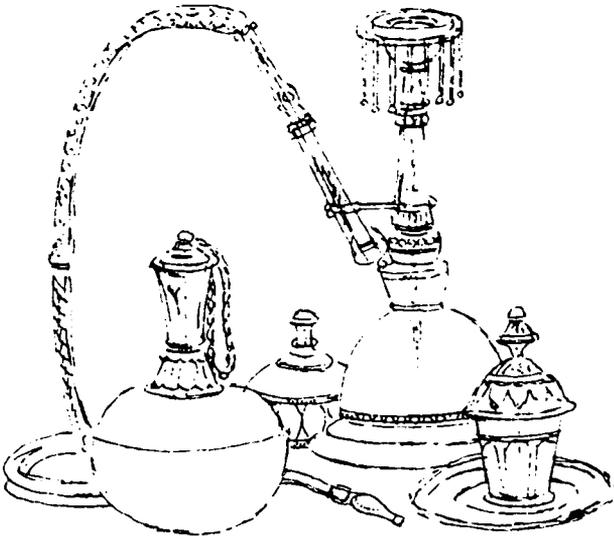
গ্রীষ্মের কলকাতা। মাথার ওপরে তপ্ত সূর্য। হাওয়ায় বসন্তের কোনও আভাস নেই। ক্লান্ত অবসন্ন লক্ষ্ণৌর নবাব কোম্পানির রাজধানীতে নেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে তখনও নিশ্চয় জ্বলজ্বল করছে দু' মাস আগের ঘটনাবলি। বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছিল খবরটা। রেসিডেন্ট জেমস উট্রাম কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন ৩০ জানুয়ারি। পৌঁছেই মন্ত্রী আলি নকি খাঁকে ডেকে তিনি জানিয়ে দিলেন গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত। আলি নকি বিস্ময়ে হতবাক। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না ইংরাজ সরকার কেন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছেন। ওয়াজিদ আলির সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষদের তুলনা করলেন আলি নকি। নবাব সংস্কারমূলক কী কী কাজ করেছেন তার ফিরিস্তি দিলেন। রেসিডেন্টের কাছে যথাসাধ্য সওয়াল করলেন তিনি। উট্রাম বললেন—তিনি নিরুপায়। সিদ্ধান্ত পাকা। আউধের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি এটাও জানাতে ভুললেন না যে, কানপুর থেকে ব্রিটিশ বাহিনী রওনা হয়েছে লক্ষ্ণৌর দিকে। দেশে সবে রেল এসেছে। টেলিগ্রাফ এসেছে। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাফেই খবর পাঠানো হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার হুইলারকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করতে। সব শুনে বজ্রাহতের মতো মন্ত্রী চললেন প্রাসাদের দিকে।

ওয়াজিদ আলিও মনোযোগ দিয়ে আলি নকির বক্তব্য শুনলেন। নীরবে। তিনিও স্তম্ভিত। বললেন—আমি স্বয়ং লর্ড ডালহৌসির কাছে আবেদন জানাব। সন্ধির শর্ত পাল্টাবার জন্য আমি দরকার হলে সাগর পাড়ি দেব, বিলাত যাব। পরের দিন, ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে নবাব চিঠি লিখতে বসলেন রেসিডেন্টকে। বিনম্র চিঠি। বেদনা-ভরা ভাষা। কাতর আবেদন তাতে। বক্তব্য : তিনি সজ্ঞানে এমন কোনও কাজ

করেননি যাতে ব্রিটিশ সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন। সব সময়েই তিনি চেষ্টা করেছেন রাজসরকারের কর্মচারীদের মন জুগিয়ে চলতে। যখন সরকারের তরফে যে নির্দেশ এসেছে তিনি তা মান্য করে চলেছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের পরামর্শ মতো তিনি শাসন সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করা হয়েছে। ইত্যাদি। রেসিডেন্টের এক কথা—তিনি নিরুপায়।

নবাবের মা আমজাদ আলির বিধবা জনাব আউলিয়া বেগম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তিনি বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী রমণী। খবর শুনে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল আমরা তা শুনেছি। রাগে অভিমানে তিনি ছুটেছিলেন নবাবের কাছে। কঠোর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু সেটুকু করেই তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। ঘরে ফিরে রেসিডেন্টকে তিনি খবর পাঠালেন একবার তাঁকে সঙ্গে দেখা করতে। রেসিডেন্ট নবাবজননীর সঙ্গে দেখা করলেন। চিকের আড়ালে বসে আবেগপূর্ণ ভাষায় বেগম আউলিয়া সওয়াল করলেন তাঁর কাছে। তাঁর গলায় একদিকে রাজকীয় গাম্ভীর্য, অন্যদিকে সুসংস্কৃত খানদানি ভঙ্গি। তিনি বললেন—আমি সময় চাই। রাজ্যে নিশ্চয় শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে। দেশ শাসনে ত্রুটিবিচ্যুতি যদি কিছু ঘটে থাকে তবে নিশ্চয়ই তা সংশোধন করা হবে। রেসিডেন্ট তাঁকে সবিনয়ে জানালেন—তাঁর কিছু করণীয় নেই। এ সিদ্ধান্ত সরকারের। তিনি হুকুম তালিম করছেন মাত্র। বেগম আউলিয়াকে তিনি অনুরোধ জানালেন—নবাবের ওপর তাঁর প্রভাব খাটাতে, তাঁকে সন্ধিপত্রে সই দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে। এ-বৈঠকও বিফলে গেল।

ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে রেসিডেন্ট ও তাঁর সহকারীরা প্রাসাদের দিকে চললেন নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। সহকারী রেসিডেন্ট বার্ড-কে আগেই লক্ষ্ণৌ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন নবারে প্রতি সহানুভূতিশীল। উট্রামের সঙ্গে সেদিন সহকারী ক্যাপ্টেন হেইস (Hayes) এবং ক্যাপ্টেন ওয়েস্টন (Weston)। সেদিন সোমবার। হুইলারের ফৌজ তখন লক্ষ্ণৌ থেকে মাত্র আট মাইল দূরে। আবহাওয়া ভাল নয়। যদিও শীতকাল, ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ওই অঞ্চলে। বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করেই নবাবের রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে ইংরাজবাহিনী। এদিকে জার্দ কোঠি প্রাসাদের (Zard Kothi Palace) দিকে চলেছেন উট্রাম আর তাঁর সঙ্গীরা।

প্রাসাদে পৌঁছে ওঁরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ জনমানবহীন। তোরণ থেকে কামান নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রাসাদরক্ষীদের হাতেও কোনও অস্ত্র নেই। খালি হাতেই তারা অভিবাদন জানাল ইংরাজ-রাজের প্রতিনিধিদের। ওয়াজিদ আলি শাহ বিনয়ী। তিনি জানেন, কোথায় তিনি আছেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস কী, কারা এই রাজ্যের সত্যকারের প্রভু। তিনি কোথাও কোনও

ঔদ্ধত্যের চিহ্ন রাখতে চান না। সাদরে সৌজন্য সহকারে তিনি গ্রহণ করলেন রেসিডেন্ট উট্রাম এবং তাঁর দুই ইংরাজ সৈন্যকে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আলি নকি খাঁ ছাড়াও হাজির নবাবের ভাই সিকেন্দর হাসমত, রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত উকিল মুসিউদ্দৌলা, তাঁর সহকারী সাহিবউদ্দৌলা, এবং নবাবের অর্থমন্ত্রী রাজা বালকিষান। উট্রাম নবাবের হাতে গভর্নর জেনারেলের চিঠিখানা তুলে দিলেন। আলি নকি খাঁকে আগেই দেখানো হয়েছিল তার প্রতিলিপি। এবার মূল চিঠি। চিঠির সঙ্গে সন্ধিপত্র। উট্রাম বললেন, নবাব ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে বর্জন করতে পারেন। যা তাঁর অভিরুচি। তিন দিন সময় দেওয়া হল।

লর্ড ডালহৌসির চিঠিখানা পড়ে নবাব রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। বললেন—এই কি আমার প্রাপ্য ? কী অপরাধ করেছি আমি ? সন্ধিপত্রটি তিনি তুলে দিলেন সাহিবউদ্দৌলার হাতে। বললেন—সবাইকে শুনিয়ে পড়। অনুগত ভৃত্য সাহিবউদ্দৌলা দু'চার ছত্রের বেশি পড়তে পারলেন না। তাঁর গলা জড়িয়ে এল, চোখ জলে ঝাপসা। নবাব তাঁর হাত থেকে কাগজটা টেনে নিলেন। তারপর সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি অনুচ্ছেদ শেষ করলেন। দুঃখে, উত্তেজনায়, অভিমানে হঠাৎ ফেটে পড়লেন তিনি। বললেন :

সন্ধি হয় সমানে সমানে। আমি কে, যে ব্রিটিশ সরকার আমার সেঙ্গে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান ? শত বছর ধরে এই বংশ আউধে বিকশিত হয়েছে, রাজত্ব করেছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বরাবর তাঁদের সমর্থন জানিয়ে এসেছেন, তাঁদের রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আউধের শাসকরাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের কর্তব্য যথাযথ এবং পরিপূর্ণভাবে পালন করে এসেছেন। এই রাজ্য ইংরাজদেরই সৃষ্টি। তারা ইচ্ছে করলে কাউকে রাজা বানাতে পারে, কাউকে গদিতে না-ও রাখতে পারে। ইচ্ছে করলে কাউকে তুলতে পারে, কাউকে নামাতে পারে। তারা যা হুকুম দেবে, তা-ই হবে। কেউ ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না, কেউ তাদের বিরোধিতা করবে না। আমি এবং আমার প্রজারা ইংরাজ সরকারের ভৃত্য মাত্র !

এ কি বিনয়, না ব্যঙ্গ ? না কি আত্মধিক্কার ? মুসিউদ্দৌলা সাহেবদের দিকে ঘুরে বললেন, নবাব ইতিমধ্যেই প্রাসাদ থেকে কামান নামিয়ে নিয়েছেন। সৈন্যদের নিরস্ত্র করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। নবাবও সায় দিলেন তাঁর কথায়। বললেন—রেসিডেন্ট সাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি এবং আমার প্রজারা কতখানি অসহায়। আমাদের প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতা নেই। নবাব আরও বললেন—সন্ধিচুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই। এই কাগজে তাঁর সই করার ক্ষমতা

নেই। অবান্তর এই চুক্তি। তাঁর রাজত্ব নেই, মর্যাদাও নেই। না, তিনি কোম্পানির পেনসন চান না। ভারতে যখন অবিচারের প্রতিকার নেই তখন বিচারের সন্ধানে তিনি ইংল্যান্ড যাবেন। সেইখানে রাজসিংহাসনের সামনে এই আদেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য আর্জি পেশ করবেন। সেখানেই তিনি মার্জনা ভিক্ষা করবেন। নাটকীয়ভাবে নিজের মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে তিনি তা তুলে দিলেন বিমূঢ় রেসিডেন্টের হাতে। একজন আধুনিক ইংরাজ গবেষক লিখছেন—ওয়াজিদ আলি শাহ যেন সেদিন শেক্সপিয়ারের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড। মাথা নিচু করে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন উট্রাম। ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির সাক্ষী তিনি।

লর্ড ডালহৌসি আগের বছর (১৮৫৫) জুন মাসে নীলগিরিতে বসে আউধ সম্পর্কে যে দীর্ঘ 'মিনিট'টি রচনা করে বিলাতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে চারটি বিকল্প প্রস্তাব ছিল। একটি প্রস্তাব ছিল : আউধের বাদশা যে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তব্য সে ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। নবাব নামে মাত্র নবাব থাকবেন, এই যা। নভেম্বরে কোর্ট অব ডাইরেক্টারস জানালেন—নবাব যদি প্রশাসন এবং রাজস্ব-পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানির হাতে সমর্পণ করে নামে মাত্র নবাব থাকতে চান তবে তাঁদের আপত্তি নেই। আর নবাব যদি তাতে সম্মত না হন তবে আউধকে কোম্পানির রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়াই সঙ্গত। ১৮৫৬ সনের ২ জানুয়ারি সেই নির্দেশ এসে পৌঁছল কলকাতায়। কলকাতা কাউন্সিল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে উট্রামের হাতে তুলে দিলেন একটি সন্ধিপত্র আর দুটি ঘোষণার বয়ান। উট্রাম ওয়াজিদ আলির হাতে যে সন্ধিপত্রটি তুলে দিয়েছিলেন তার বক্তব্য ছিল অনেকটা ডালহৌসির 'মিনিট'-এর দ্বিতীয় প্রস্তাবটির মতো। তাতে বলা হয়েছিল শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিলে লক্ষ্ণৌর নবাব তথা আউধের বাদশা বরাবরের মতো বাদশাই থাকবেন। তাঁর বংশধরদেরও সেই খেতাব থাকবে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সামরিক অসামরিক শাসনক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে দিলে নবাব এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা বছরে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ভাতা পাবেন। নবাবের প্রাসাদ ছাড়াও দিলখুশা, বিবিয়াপুর এবং আরও কয়েকটি প্রাসাদ বাগানবাগিচার ওপর তাঁদের অধিকার বহাল থাকবে। আর চুক্তিতে সই না করলে রাজত্বের সঙ্গে খেতাবও হারাতে হবে চিরকালের মতো।

সর্বনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে বিজ্ঞরা নাকি অর্ধেক ত্যাগে আপত্তি করেন না। কিন্তু ওয়াজিদ আলি লক্ষ্ণৌর বাদশার ক্ষমতার যে যৎসামান্য হাতে আছে তা খোয়াতে রাজি হলেন না। হাতে যদি শাসনের কোনও ক্ষমতাই না থাকে, তবে কী হবে নামকাওয়াস্তে 'বাদশা' থেকে। ৪ ফেব্রুয়ারি উট্রামকে তিনি মুখেই জানিয়ে দিয়েছিলেন

এই চুক্তি সম্পর্কে তাঁর অরুচির কথা। তিন দিন পরে ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে এক সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তিনি রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিলেন—সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত। নবাব সন্ধির দলিলে সই করছেন না। তিনি কলকাতা যাবেন। দরকার হলে সেখান থেকে পাড়ি দেবেন লন্ডনে।

সেদিন দুপুরেই শেষ হয়ে গেছে তিন দিনের মেয়াদ। উট্রাম মন্ত্রী এবং দরবারের অন্যান্য গণ্যমান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকারিভাবে ঘোষণা করলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য অধিগ্রহণের কথা। ততক্ষণে শহরের এখানে ওখানে মোতায়েন হয়ে গেছে কোম্পানির ফৌজ। যেন—'কু দেতা'। শুধু প্রাসাদে নয়, শহর জুড়ে শোকের ছায়া। চারদিকে অবিশ্বাস্য নীরবতা। লহমায় যেন শান্তি নেমে এসেছে চর্তুদিকে। সে কি কোম্পানির ঘুমপাড়ানিয়া মরণ-কাঠির স্পর্শে? নাকি, এই অচেতন দশা আচমকা আঘাতে? কে জানত, লক্ষ্ণৌর এই থমথমে মুখ ঝড়েরই পূর্বাভাস।

তারের যুগ। পরদিনই (৮ ফেব্রুয়ারি) অধিগ্রহণের খবর পৌঁছল কলকাতায়। তার দশ দিন আগে অন্য খবর, ক্যানিং এসে নেমেছেন বোম্বাইয়ে। অসুস্থ ডালহৌসির ইচ্ছে ছিল জানুয়ারিতেই কলকাতা ছাড়েন। শুধু এই আউধ সমস্যার একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই তিনি মার্চ অবধি এদেশে থাকতে সম্মত হয়েছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাটে কাজটা হয়ে গেল দেখে স্বভাবতই তিনি অতিশয় প্রীত। জার্নালে লিখেছেন—'সো আওয়ার গ্রেশাস কুইন হ্যাভ ফাইভ মিলিয়ন মোর সাবজেক্টস অ্যান্ড ১,৩০০,০০০ পাউন্ডস মোর রেভিনিউ দ্যান শি হ্যাড ইয়েস্টারডে।' অর্থাৎ, মহামান্য রানি রাতারাতি পেয়ে গেলেন আরও পঞ্চাশ লাখ প্রজা এবং বছরে তেরো লক্ষ পাউন্ড বাড়তি রাজস্ব। ইচ্ছে করলে তিনি আরও একটি তথ্য যোগ করতে পারতেন—আমাদের প্রিয় রানি সেই সঙ্গে পেলেন চল্লিশ হাজার বর্গমাইল উর্বর জমি!
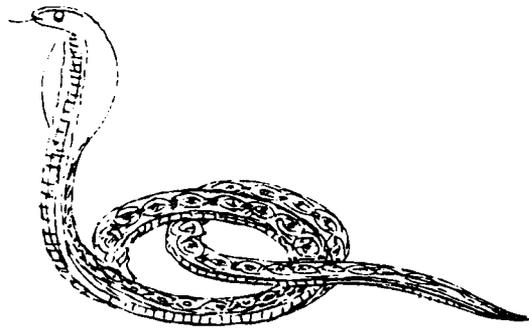
অযোধ্যা কি প্রজার স্বার্থে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, না কোম্পানির নিজের স্বার্থে ? এই প্রশ্ন সেকালে একেবারে শোনা যায়নি এমন নয়। স্যামুয়েল লুকাস-এর 'ডেকয়টি ইন এক্সসেলসিস' সেদিন বেশ জনপ্রিয় বই। নবাবরা নন, সে বইয়ে লুঠেরার ভূমিকায় স্বয়ং কোম্পানি বাহাদুর। সার জন শোর ('নোটস অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স') এবং হেনরি লরেন্সও ('এসেজ অন দি আর্মি অ্যান্ড আউধ') ছিলেন নবাবদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। সেকালেই একটা তত্ত্ব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে ইংরাজদের মধ্যে—রাজা বা নবাব অত্যাচারী হলে তাঁকে শাসন করবে কে ? অনেকেই মনে করতেন সে অধিকার প্রজাদের। কিন্তু ভারতে বিষপ্রয়োগে বা অন্য কোনও ভাবে শাসককে সরিয়ে দেওয়ার অনেক নজির থাকলেও প্রজাবিদ্রোহের ফলে শাসকরা গদি হারাচ্ছেন এমন কথা শোনা যায় না। একদল বললেন—শোনা যায় না, কারণ রাজ্যগুলিতে মোতায়েন ইংরাজ ফৌজ সে ধরনের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। আউধের গ্রামাঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য কথায় কথায় ডাক পড়ে কোম্পানির ফৌজের। সুতরাং, তাঁরা মনে করেন নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করে কোম্পানির উচিত আউধ থেকে কোম্পানির ফৌজ পুরোপুরি উঠিয়ে নেওয়া। রাজত্ব রক্ষার জন্য নবাবকে তখন বাধ্য হয়েই প্রজাদের খুশি রাখতে হবে। অন্য দল সৈন্য অপসারণে রাজি নন। কারণ, শুধু রাজ্যের ভিতরে শান্তিরক্ষা নয়, সৈন্যদের কাজ বাইরের শত্রুর হাত থেকেও রাজ্যটিকে রক্ষা। স্লিম্যানকে আউধের এক সামন্ত শুনিয়েছিলেন তাঁর তত্ত্ব। তিনি বলছিলেন—শাসকদের ক্ষুধা থাকবেই। যদি কোনও শাসক মনে করেন তাঁর পেট ভরে গেছে তা হলে তাঁর দিন শেষ। ইংরাজের ক্ষুধার কি শেষ আছে ? তোমরা কি একের পর এক রাজ্য গ্রাস করছ না ? তবে আউধে কেউ নবাবের অনুমতি নিয়ে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করছে, নিজের ক্ষুধা মেটাচ্ছে তা নিয়ে এত ভাববার কী আছে ? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অর্থাৎ, সামান্য দস্যু আর অসামান্য দস্যু, ইতিহাসে যাঁরা বিজয়ী বীর হিসাবে বন্দিত তাঁদের উপমা। কাহিনীর দস্যু বলেছিল বিজয়ী বীরকে—তুমিও কি দস্যু নও ?

একালেও আউধ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এ দেশ এবং বিদেশের অনেক গবেষকেরই আলোচ্য কোম্পানির অযোধ্যা গ্রাস। কেউ কেউ খোলাখুলি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—ওয়াজিদ আলির তথাকথিত অপদার্থতা ওজর মাত্র। গোড়া থেকেই কোম্পানির নজর ছিল সুন্দর, সমৃদ্ধ, উর্বর অযোধ্যার দিকে। স্লিম্যান বা উট্রাম, যাঁদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ডালহৌসি থাবা বাড়িয়েছিলেন আউধের দিকে, তাঁরা কোম্পানির স্বার্থেই কাজ করেছেন। প্রজাহিতের চেয়েও তাঁদের নজর ছিল কোম্পানির বর্ধমান ক্ষুধা মেটানোর দিকে। সাম্রাজ্য গড়ার নিপুণ কারিগর ওঁরা।

কলকাতায় আসার আগে ভূতপূর্ব বাদশা ওয়াজিদ আলি লক্ষ্ণৌয় যে নাটকে অংশগ্রহণ করে এলেন তার চিত্রনাট্য রচিত হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। আগেই বলা হয়েছে সেই ১৮০১ সনের চুক্তির দিন থেকেই লক্ষ্ণৌর নবাবদের সঙ্গে ইংরাজদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তার আগেই, বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবশ্য আউধের নবাবের সংস্পর্শে আসে। গদিতে তখন সুজাউদ্দৌলা। তাঁর সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গভীর বোঝাপড়ার সূত্রপাত নবাব সাদত আলির সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই ওয়েলেসলির মিত্রতা-চুক্তি (১৮০১)। ১৮৩৭-এ নাসিরউদ্দিনের আমলে লর্ড অকল্যান্ড সেই বনিয়াদকে আরও মজবুত করলেন। অযোধ্যা সেই সেকাল থেকেই ইংরাজের সঙ্গে 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র নাগপাশে বাঁধা। যথা : হায়দরাবাদ, মহীশূর, নাগপুর, বরোদা, কোচিন কিংবা ত্রিবাঙ্কুর। পিছনে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না কোম্পানি সেদিন শুধু সুযোগের অপেক্ষায়।

অবশেষে সে সুযোগ এসেছে। নেপাল-যুদ্ধ শেষ। শিখরা বশ মেনেছে। ব্রহ্মের একাংশও কোম্পানির হাতে। ডালহৌসির আমলে কোম্পানির রাজত্ব যদি একদিকে পেগু থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত, তবে অন্যদিকে সিমলা থেকে মহীশূর। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই সুজলা সুফলা আউধই বা বাকি থাকবে কেন ? বিশেষত, রাজ্যটি হাতে তুলে নিলে যখন মুনাফার অঙ্ক বেড়ে যাবে অনেক অনেকগুণ বেশি। তা ছাড়া, আউধ হাতে আসা মানে অবশিষ্ট ভারতে কোম্পানির সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভুত্বকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলা। সুতরাং, নিঃশব্দে শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি।

পিতা আমজাদ আলি দেহরক্ষা করলেন ১৮৪৭ সনের ফেব্রুয়ারি। ওয়াজিদ আলি গুছিয়ে সিংহাসনে বসতে না বসতে সে বছরই জুলাই মাসে কলকাতার সুপ্রিম কাউন্সিল থেকে চিঠি গেল লক্ষ্ণৌয় রেসিডেন্টের কাছে—বাদশাকে স্মরণ করিয়ে দাও, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। নয়তো ১৮০১ এবং ১৮৩৭ সনের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হবে। নবাবকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হল না যে, ১৮৩৭ সনে অকল্যান্ড যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছিলেন কোম্পানির বিলাতের কর্তৃপক্ষ সেটি পত্রপাঠ খারিজ

করে দিয়েছিলেন। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর মুন্না জানকে নিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ইংরাজরা কেমন করে বৃদ্ধ মুহম্মদ আলি শাহকে গদিতে বসিয়েছিলেন সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। মুহম্মদ আলি সিংহাসনে বসার আগেই রেসিডেন্ট তাঁকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়েছিলেন। ১৮৩৭ সনের সেপ্টেম্বরে লর্ড অকল্যান্ড তাঁকে সই করতে বাধ্য করলেন একটি অন্যায়, অবান্তর, অপমানকর সন্ধিপত্রে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সেটি দেখে স্তম্ভিত। নতুন নবাবকে কোনও সুযোগ না দিয়েই এভাবে তাঁকে দিয়ে কোনও দলিল সই করিয়ে নেওয়া কি সঙ্গত ? যে কেউ এই চুক্তির পটভূমির কথা মনে রাখলেই বুঝতে পারবেন এটি নবাবের ওপর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন—গত পঞ্চাশ বছর ধরে অযোধ্যায় ইংরাজরা যে দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছিল এই চুক্তি সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে দিব্য খাপ খেয়ে যায়। তবে দস্যুতা এবার আরও নগ্ন, আরও প্রকাশ্য। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সেটি বাতিল করে অন্তত এটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁরা তখনও পুরোপুরি চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দেননি। লর্ড অকল্যান্ড কিন্তু নবাবের কাছে চুক্তি বাতিলের খবরটা একদম চেপে গেলেন। শুধু তাই নয়, চুক্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি এমনভাবে গোপন করেছিলেন যে, পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ জানতেই পারেননি যে ১৮৩৭ সনের চুক্তি একটি মৃত দলিল। এমনকি ১৮৫৩ সনেও স্লিম্যানের ধারণা—চুক্তিটি তখনও বহাল আছে। আশ্চর্য, কলকাতা-কাউন্সিল এই মিথ্যা চুক্তির কথাই মনে করিয়ে দিলেন নতুন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে। রেসিডেন্ট তাঁকে জানিয়ে দিলেন—প্রজাদের কাছ থেকে শুধু কর আদায় করলেই চলবে না, তাদের প্রতি দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। সুবোধ বালকের মতো ওয়াজিদ আলি মেনে নিলেন সে কথা।

সে বছরই নভেম্বরে (১৮৪৭) লক্ষ্ণৌয় এসে হাজির হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। তাঁর উপস্থিতিতে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি পড়ে শোনান হল নবাবকে। বক্তব্য : কোম্পানি বাহাদুর শুধু যে এদেশের রাজন্যবর্গের প্রভুত্বকে মজবুত করে গড়ে তুলছেন তা নয়, প্রজাদের ন্যায্য অধিকার যাতে রক্ষিত হয় সেদিকেও নজর রাখছেন। নবাব যেন পুরানো সন্ধির শর্তগুলো সব সময় মনে রাখেন। তিনি যদি এখনও ঘর না সামলান, ঠিক মতো শাসন না চালান তবে কোম্পানির অধিকার আছে আউধের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। হার্ডিঞ্জ প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন কোম্পানির সে বাসনা ক্রমেই বাড়ছে।

যা হোক, নবাবকে কথা দেওয়া হল ভাল ছেলের মতো চললে ভয়ের কিছু নেই। তাঁকে দু' বছর সময় দেওয়া হল শাসন সংস্কারের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা সোজাসুজি এটাও জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যদি সে কাজে ব্যর্থ হন তবে বিপদ, ব্রিটিশ

গভর্নমেন্ট বাধ্য হবেন রাজ্যের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে।

দু' বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৮৪৯ সনের অক্টোবরে। তার আগেই হার্ডিঞ্জ বিদায় নিলেন। ১৮৪৮ সনের জানুয়ারিতে কলকাতার রাজভবনে এলেন নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি। আউধের ফাইল দেখেশুনে উইলিয়াম স্লিম্যানকে তিনি অনুরোধ করলেন লক্ষ্ণৌয় রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করতে। ১৭৭৩ থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত নানা মেজাজের রকমারি চরিত্রের অন্তত বাইশ জন রেসিডেন্ট কাজ বা অকাজ করেছেন লক্ষ্ণৌয়। কেউ কেউ দরবারের কাজে যখন তখন এমন হস্তক্ষেপ করতেন যে, কলকাতার কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বাধ্য হতেন তাঁদের সরিয়ে নিতে, কিংবা শাসন করতে। অবশ্য প্রকাশ্যে কখনও তাঁদের নিন্দা করা হত না, কারণ তা হলে স্বদেশ এবং স্বজাতির মুখ থাকে না। ডালহৌসি যখন গদিতে বসেছেন লক্ষ্ণৌয় রেসিডেন্ট তখন ক্যাপ্টেন এ এফ রিচমন্ড। অতঃপর তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিতে চললেন উইলিয়াম স্লিম্যান। স্লিম্যান অভিজ্ঞ শাসক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি এদেশে আছেন। ঠগিদের দমন করে তিনি ভারতে এক প্রবাদপুরুষে পরিণত। মধ্যপ্রদেশে একটা জায়গার নামই হয়ে গেল তাঁর নামে—স্লিমানাবাদ। আউধের নাম শুনে প্রবীণ প্রশাসক চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কেন না, ডালহৌসি লিখেছেন—'এই সুবিশাল, সমৃদ্ধ এবং অত্যাচারিত ভূখণ্ডে অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা একই সঙ্গে মহান এবং জটিল ব্রত।' স্লিম্যান এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। নতুন বছরের (১৮৪৯) জানুয়ারি মাসেই তিনি হাজির হলেন লক্ষ্ণৌ।

সেই শীতেই বের হলেন তিনি রাজ্য পরিক্রমায়। তাঁর বয়স তখন একষট্টি। রেসিডেন্টের সহযাত্রী কিছু ইংরাজ সহকর্মী এবং বান্ধব। সঙ্গে রয়েছে দুশ সিপাই এবং অগণিত অনুচর পার্শ্বচর। আগে আগে চলেছেন সাহেবরা। তাঁরা হাতির পিঠে। পিছনে অন্যরা। কেউ ঘোড়ায়, কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। দশ বারো মাইল জুড়ে সে যেন এক রাজকীয় শোভাযাত্রা। যেন কোনও রাজকর্মচারী নন, প্রমোদভ্রমণে চলেছেন অযোধ্যার কোনও নবাব। অযোধ্যার নবাবের হাতে তখন বারোটি জেলা : লক্ষ্ণৌ, উনাও, রায়বেরেলি, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, গোন্ডা, বাহারাইচ, মাহমুদি, হারদোই, দরিয়াবাদ এবং সীতাপুর। রেসিডেন্ট স্লিম্যান প্রত্যেকটি জেলা পরিক্রমা করলেন। এই অভিযাত্রার ফসল দুই খন্ডের বিশাল বই—'জার্নি থ্রু দি কিংডম অব আউধ।' নবাবের ব্যক্তিগত জীবন থেকে জমিদার তালুকদার এবং দীনহীন প্রজার জীবনাচার—অনেক কাহিনীই রয়েছে এই বইটিতে। অনেকেরই জবানবন্দী শুনেছেন তিনি। হয়তো স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল চেষ্টা করেছে তাঁকে প্রভাবিত করতে, কিন্তু সকলেই মানেন, স্লিম্যানের এই প্রতিবেদন অযোধ্যার একটা মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ।

বইটি সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সনে। কিন্তু তার ছয় বছর আগেই (১৮৫২) রেসিডেন্সিতে একটা ছোট্ট ছাপাখানা বসিয়ে গোপনে সেটি ছেপে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোম্পানির বড়কর্তাদের কাছে। স্লিম্যান লিখেছিলেন—'আমি আর আমার কম্পোজিটার ছাড়া এ বইয়ের কথা কেউ জানে না।'

স্লিম্যান নবাবের প্রতি গোড়া থেকেই বিরূপ। ওয়াজিদ আলিকে তিনি বলেছেন—'ক্রেজি ইমবেসাইল।' উন্মাদ এবং অপদার্থ। তাঁর পরবর্তীরা, এবং পরবর্তী কালের অনেক এদেশীয় লেখকও ওয়াজিদ আলিকে চিত্রিত করেছেন স্লিম্যানকে সাক্ষী মেনেই। ওয়াজিদ আলির হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেওয়ার সময়ও অনেকে স্মরণ করেছেন স্লিম্যানকে। স্লিম্যান অবশ্য অধিকরণের পক্ষে ছিলেন না। তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন সরাসরি রাজ্য কেড়ে নিলে বিদ্রোহ অনিবার্য। তবে সন্দেহ নেই, নবাবের রাজত্ব অধিকরণের আগে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই। অথচ আধুনিক গবেষকরা মনে করেন স্লিম্যান তখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। তিনি তাঁর সহকারী রবার্ট বার্ড এবং রেসিডেন্সির চিকিৎসক ডাঃ বেলকে নিয়ে যে সব কাণ্ডকারখানা করেছেন তাঁরা সে সব প্রসঙ্গও এড়িয়ে যেতে পারছেন না। স্লিম্যান তখন কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি ওয়াজিদ আলি শাহও। তাঁর মন্ত্রীর সচিব ওয়াসি আলি খান নাকি রেসিডেন্টকে হত্যার চক্রান্ত করছে। অনেক হল্লা করেছেন স্লিম্যান তাই নিয়ে। 'দিস সর্ট অব ইললজিক্যালিটি ইজ অ্যান অ্যাকনলেজড সিমটম অব প্যারানয়েড ডেলিউশান'—লিখেছেন জন পেম্বেল। ('দি রাজ, দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি অ্যান্ড দি কিংডম অব আউধ ; ১৮০১—১৮৫৯) পেম্বেল লক্ষ্ণৌয় স্লিম্যানের আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি ছিলেন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। 'স্লিম্যান ওয়াজ এ ম্যান হুজ জাজমেন্ট ওয়াজ ক্লাউডেড বাই সাইকোলজিক্যাল ডিসওর্ডার'—খোলাখুলি মন্তব্য তাঁর। অথচ প্রধানত এই স্লিম্যানের জন্যই ওয়াজিদ আলি শাহ সেদিন এক ফূর্তিবাজ কবিযশপ্রার্থী কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ হিসাবে প্রচারিত। এই স্লিম্যানকে মাথায় রেখেই মনে মনে লর্ড ডালহৌসির জাল বোনা! আজকের ঐতিহাসিকরা বলেন—স্লিম্যানের মতোই লক্ষ্ণৌ-দরবারের বিলাস, উচ্ছল জীবনধারা, উচ্চকণ্ঠ হাসি অসহ্য ঠেকত ডালহৌসির কাছেও। বিশেষত স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমোদ-আহ্লাদ নাকি মোটে বরদাস্ত করতে পারতেন না তিনি। তাঁর মনে হত লক্ষ্ণৌর ওই আনন্দ-উচ্ছ্বাস বুঝি বা তাঁকে বিদ্রূপ করার জন্যই!

এই সব রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কিংবা খেয়ালখুশিই অযোধ্যার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। এই রাজ্যের ভাগ্যও সেদিন নানা ঐতিহাসিক কার্য-কারণের অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তবু যে কথায়

কথায় স্লিম্যান এবং ডালহৌসির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে গেল তার কারণ আউধ হারাবার সব দায় আমরা চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত আর একজন ব্যক্তির ঘাড়ে। যেন ওয়াজিদ আলি ভাল শাসক হলেই তাঁর রাজ্যটি থেকে যেত। এই পরিণতির পিছনে, বলাই বাহুল্য, নবাবের ব্যক্তিগত চরিত্র উপলক্ষ মাত্র।

যা হোক, ওয়াজিদ আলিকে নৈতিকতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন স্লিম্যান। ১৮৫৪ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি ছাড়লেন। তাঁর জায়গায় নতুন রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন জেমস উট্রাম। কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌর পথে তাঁর সঙ্গে স্লিম্যানের প্রথম এবং শেষ দেখা। ১৮৫৬ সনের ৪ ফেব্রুয়ারিতে স্লিম্যান 'নাইট' হন। তার ছয়দিন পরে স্বদেশের পথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু। স্লিম্যানের বয়স তখন সাতষট্টি। স্লিম্যানের মৃত্যু ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে, আউধ-অধিগ্রহণ ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখের ঘটনা। জাহাজে স্লিম্যানের কাছে কি সে খবর পৌঁছেছিল ? জানি না। উট্রাম কানপুরে পৌঁছন ডিসেম্বরের ২ তারিখে (১৮৫৪)। ৫ তারিখে সরকারিভাবে লক্ষ্ণৌয়। যথারীতি বিরাট এবং বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রাসহকারে তাঁকে সংবর্ধনা জানান হল। নবাব অসুস্থ, অতএব অনুপস্থিত। তাঁর বদলে নতুন রেসিডেন্টকে স্বাগত জানালেন নবাবজাদা। দিলখুশা আর রেসিডেন্সির মাঝামাঝি একটা জায়গায়। নবাবের প্রতিনিধিকে রেসিডেন্সি অবধি যেতে হল না, রেসিডেন্টকেও আসতে হল না প্রাসাদ অবধি। মধ্যপথে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা। রেসিডেন্টকে নিয়েও তখন কত না কেতা আর প্রথা !

যথারীতি জেমস উট্রামকেও বলা হয়েছিল রাজ্যের চলতি হাল সম্পর্কে একটি বিবরণ পাঠাতে। সাত বছর আগে লর্ড হার্ডিঞ্জ যে সব সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই মতো কাজ হচ্ছে কি ? ১৮০১ সনে চুক্তি মতো আমরা কি আমাদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করছি ? কলকাতার কর্তাদের ইঙ্গিতপূর্ণ নানা জিজ্ঞাসা। তার উত্তরে ১৮৫৫ সনের মার্চ মাসে উট্রাম এক বিশাল প্রতিবেদন পাঠালেন কলকাতায়। রীতিমত গবেষণা-পুস্তক যেন ! তার সাতটি ভাগ। সব ভাগ হয়তো সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু লর্ড ডালহৌসির কাছে সেই মুহূর্তে সবই মূল্যবান। তিনি তৈরি।

উট্রাম লিখেছেন—মনে হয় ১৮৫৩ এবং ১৮৫৪ সনে রাজ্যের রাজস্ব ছিল ১২ লক্ষ পাউন্ড। তবে বড়জোর তার তিন ভাগের এক ভাগ রাজকোষে জমা পড়েছে, বাকি অর্থ অন্যরা পকেটস্থ করেছে। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ষাট হাজার। চারটে রেজিমেন্টের পুরোভাগে রয়েছে ইউরোপীয় অফিসাররা। সেগুলোর অবস্থা মোটামুটি ভাল। অন্য রেজিমেন্টগুলোর হাল মোটেই সুবিধের নয়। সিপাইদের মাইনে মাসে তিন চার টাকা। তা-ও অনেকে পাচ্ছে না। বাকি পড়ে আছে। স্বভাবতই ওদের দিন চলে কৃষকদের ওপর জবরদস্তি করে। রাজ্যে পূর্ত বিভাগের কাজ বলতে বিশেষ কিছু নেই। পাকা

সড়ক বলতে একটিই—লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর। শহরে গোমতীর ওপর সেতু আছে দুটি। গোটা রাজ্যে আর সেতু রয়েছে মাত্র ছয়টি। ইত্যাদি।

স্লিম্যানের মতো উট্রামেরও আর এক আলোচ্য নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর বক্তিগত জীবন। নবাব সম্পর্কে তাঁকে খবরাখবর সরবরাহ করতেন রেসিডেন্সির চিকিৎসক ডাঃ ফেরার। তাঁর সংবাদসূত্র ছিল মাইনে করা ওয়াকিয়ানবিশরা। ওয়াকিয়ানবিশদের তখন খুব কদর। দরবারের খাতায় অন্তত একশ' ষাট জনের নাম ছিল। তারা শহর এবং রাজ্যের নানা খবর সংগ্রহ করে দরবারে পেশ করত। অনেক সময় পয়সার লোভে সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করত, মিথ্যাকে সত্যে। রেসিডেন্টরাও নিজস্ব ওয়াকিয়ানবিশের দল গড়ে তুলেছিলেন। এই সব গুপ্তচরেরা ডাঃ ফেরারকে যে তথ্য সরবরাহ করেন তার ভিত্তিতে রচিত ওয়াজিদ আলি শাহর একটি দিন :

আজ সকালে হিজ ম্যাজেস্টি তানজাম চড়ে মহলে গেলেন। তারপর অমুক অমুক বেগমদের নিয়ে বসে এক জোড়া ভেড়ার লড়াই দেখলেন। যে জমাদার এই খেলার আয়োজন করেছিল নবাব খুশি হয়ে তাকে একশ' টাকা দামের একটা শাল উপহার দিলেন। তারপর তিনি একজন নতুন ওস্তাদের গান শুনলেন। বেলা চারটে অবধি ঘুড়ি উড়িয়ে আমোদ করলেন। তারপর মহলে শুতে গেলেন।..... পায়রা-কুঠির তত্ত্বাবধায়ক জিউয়াল খান এক আজব চিড়িয়া দেখিয়ে একখানা শাল এবং নগদ দুশ' টাকা পুরস্কার পেল। সে এমন পায়রা দেখিয়েছে যার একটি ডানা শাদা, অন্যটি কালো। হিজ ম্যাজেস্টি এর পর বেগম খাস মহলকে তাঁর নতুন কবিতা পড়ে শোনালেন। কবিতার বিষয়—বুলবুলের প্রেম।.....ইত্যাদি।

এই প্রতিবেদন পড়েই ডালহৌসি নীলগিরি থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। তার আগেই বোর্ড অব ডাইরেক্টারসের কাছে চলে গেছে তাঁর 'মিনিট'। এখন শুধু নির্দেশের অপেক্ষা। সেই নির্দেশ নিয়েই উট্রাম কলকাতা থেকে যাত্রা করেছিলেন লক্ষ্ণৌর দিকে। একটি ঐতিহাসিক বংশের একশ' চৌত্রিশ বছরের টানা রাজত্বে লহমায় টেনে দেওয়া হয়েছিল যবনিকা। সত্যের খাতিরে বলা দরকার, স্লিম্যানের মতো উট্রামও ছিলেন সরাসরি অযোধ্যা গিলে খাওয়ার বিরুদ্ধে। কেন না, 'আউধ বন্ধু রাষ্ট্র, তার আনুগত্যে কোনও ত্রুটি নেই।'

তবু ওয়াজিদ আলি শাহ সিংহাসন হারালেন। রাজ্য হারালেন। আবদুল মুজাফর নাসির উদ্দিন সিকান্দর ঝা, বাদশা-ই-আবদুল কাইজার-ই-জামান, সুলতান-ই-আলম, ওয়াজিদ আলি শাহ ইংরাজের মন্ত্রে রাতারাতি পরিণত হলেন 'এক্স-কিং অব আউধ'-এ। এই পরিণতি কি অনিবার্য ছিল ? এবিচার কি যথাযথ ? প্রশ্নটা সেকালেও উঠেছিল। একালের একজন ইংরাজ লেখক বলেন—হ্যাঁ, যদি আমরা নৈতিকতার প্রশ্ন ভুলে যাই।

ভুলে যাই বছরের পর বছর আমাদের প্রতারণা, অর্থহীন হস্তক্ষেপ এবং ফাঁকা হুমকির কথা। ('দি অর্কিড হাউস', মাইকেল এডওয়ার্ডস)। আর একজন গবেষক আউধের অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং প্রশাসন সম্পর্কে রাশি রাশি তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন—'অ্যানার্কি' এবং 'ডিকাডেন্স', নৈরাজ্য এবং অবক্ষয়ের যে অভিযোগ তুলে ইংরাজরা অযোধ্যা কেড়ে নেয় তা রীতিমত অসার। তিনি লিখেছেন দুইজন বিশিষ্ট রেসিডেন্টের দীর্ঘ প্রতিবেদন এবং স্তূপীকৃত সরকারি কাগজপত্র পড়ে মনে হয় না যে অযোধ্যা সেদিন নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল কিংবা তার সমাজ সংস্কৃতি অবক্ষয়ে কলুষিত। তিনি লিখেছেন এ কথা অবিশ্বাস্য—'আউধ হ্যাড স্লিড ইনটু অ্যানার্কি, মাচ লেস ইটস কালচারাল অ্যান্ড সোশাল লাইফ ওয়াজ ডিকাডেন্ট।' ('ল্যান্ড, ল্যান্ডলর্ডস, অ্যান্ড দি ব্রিটিশ রাজ', টমাস আর মেটকাফ)। জন পেম্বেলের বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তাঁর মতে আউধ অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ—'অ্যান ইল্‌লিগ্যাল অ্যাক্ট, এ কনট্রাভেনশন অব ইন্টারন্যাশনাল ল, এ ওয়রলাইক ইনভেশান অব ওয়ান স্টেট বাই অ্যানাদার।' এই অধিগ্রহণ আন্তর্জাতিক আইনের ব্যভিচার। তাঁর মতে এই অধিগ্রহণ এক রাষ্ট্রের ওপর আর এক রাষ্ট্রের সশস্ত্র হামলার শামিল!
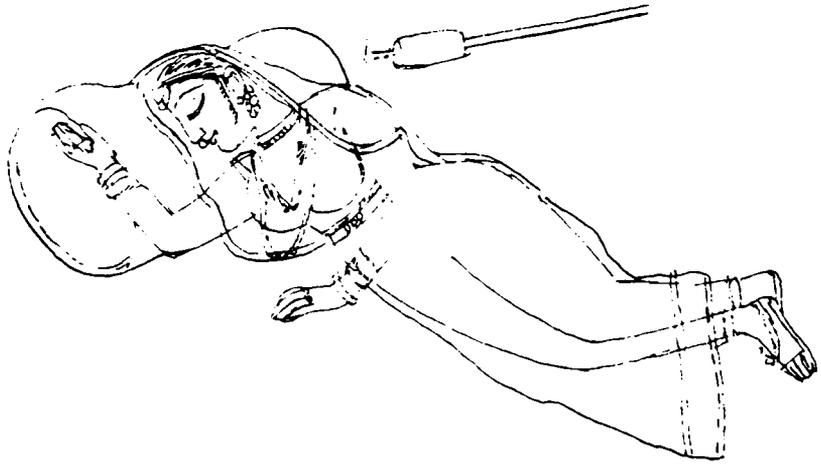
ওয়াজিদ আলি কিন্তু তখনও ভাবছেন কলকাতায় তিনি সুবিচার পাবেন। বিচার তো পরে, ইংরাজের রাজধানীতে কেউ যেন তাঁর অভিযোগ কানে তুলতেই রাজি নন। শহরে পৌঁছে তিনি চেষ্টা করেছিলেন লাটসাহেবের কাউন্সিলে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে। অনেকেই দাবিদার ছিলেন এই পদের ; আসান হুসেন খান, মির আউলাদ আলি, এমন কি প্যাটেসন নামে সুপ্রিম কোর্টের একজন ইংরাজ আইনজীবীও চেয়ে ছিলেন ভূতপূর্ব নবাবের হয়ে কাউন্সিলে সওয়াল করতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিলেন না। কলকাতায় তাঁর দূতপ্রতিম ছিলেন চিরঅনুগত এবং বিশ্বস্ত নবাব মসিউদ্দিন, যিনি লক্ষ্ণৌ-রেসিডেন্সিতে ছিলেন বাদশার উকিল। কলকাতায় বিফল হয়ে ওয়াজিদ আলি অতএব লন্ডনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এখানে রাজকর্মচারীরা তাঁর প্রতি অবিচার করলেও লন্ডনে তিনি নিশ্চয় সুবিচার পাবেন। ওয়াজিদ আলি স্পষ্টতই সেদিন ইংরাজের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত। সেটা তাঁর অপরাধ নয়। রাজ্য হারাবার পিছনে কার্যকারণ সম্পর্কগুলো তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না বলেই তিনি ইংরাজদের ভাল এবং মন্দ দুই শ্রেণীতে ভাগ করে মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। তা ছাড়া, রেসিডেন্ট যদিও খারাপ, গভর্নর জেনারেল নিশ্চয় তত খারাপ নন, এ ধরনের মনগড়া যুক্তিও হয়তো তাঁকে আশান্বিত করে তুলেছিল। কলকাতায় বড়লাট এবং তাঁর সহযোগীদের আচরণে তিনি আহত হলেন বটে, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেলেন না। ভাবলেন, ইংল্যান্ডের রানি নিশ্চয় তাঁকে এভাবে নিরাশ করবেন না। আবার সেই আমলার সঙ্গে রাজারানির পার্থক্য করার চেষ্টা! প্রভু ভৃত্য যে সেদিন একই স্বার্থের বাঁধনে বাঁধা আউধের রাজ্যহারা নবাব সেটা তখনও ধরতে পারছেন না। তিনি স্থির করলেন রাজত্ব উদ্ধারের জন্য অতঃপর লন্ডন যাত্রাই শ্রেয়।

বাদ সাধল শরীর। অনেকে বলেন, নবাব নিরস্ত হয়েছিলেন কিছু শুভানুধ্যায়ীর

পরামর্শে। তাঁরা বললেন—সাত সমুদ্রের ওপার থেকে খালি হাতে ফিরে এলে প্রজাদের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। তা ছাড়া, পথের ধকলও কম নয়, নবাব তা সহ্য করতে পারবেন না। তাঁরা পরামর্শ দিলেন—তার চেয়ে প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কাউকে পাঠানো সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন নবাব-জননী আউলিয়া বেগম।

আউধের দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে এই মহিলার সাহসিকতা সত্যিই দেখবার মতো। সেই অন্ধকারপুরীতে তিনি যেন এক জ্বলন্ত মশাল। পরিচারিকা এলু জান অনেক কাহিনীই শুনিয়ে গেছে তাঁর সম্পর্কে। প্রসঙ্গত তার কিছু কিছু শোনা যেতে পারে।

অনেক দিন পর্যন্ত আউলিয়া ছিলেন আমজাদ আলি শাহের একমাত্র বেগম। গভীর ভালবাসা ছিল দু'জনের মধ্যে। আউলিয়া নবাবের তিনটি পুত্র সন্তান এবং একমাত্র কন্যার জননী। তাদের জন্ম আমজাদ আলি সিংহাসনে বসার আগে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ বাধে নাকি আমজাদ আলি যখন সিংহাসনে বসে দ্বিতীয় একজন বেগমকে গ্রহণ করেন। বেগম আউলিয়া রাগ করে তিন দিন স্বামীর মুখদর্শন করেননি। তিন দিন নাওয়া খাওয়াও তিনি বন্ধ রেখেছিলেন। শেষে উজির এবং দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তাঁর মানভঞ্জন করেন। আমজাদ আলি যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনিই ছিলেন প্রধান বেগম। তাঁর মৃত্যুর পরও নবাবের মা হিসাবে প্রাসাদ এবং দরবারে তিনি ছিলেন সমান মান্য। চালচলনেও এই মহিলা ছিলেন রাজকীয়। তাঁর প্রিয় প্রাসাদ ছিল ছত্তর মঞ্জিল, নয়তো চৌলাখী। শহরের বাইরে পছন্দসই ছিল দ্বারকা দামের বাগান বাড়ি। তিনি অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। সকালে দশটা এগারোটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠতেন। হাত মুখ ধোওয়ার পর মোল্লা এসে নিয়মিত কোরান শরিফ পড়ে শোনাতেন তাঁকে। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি নিজেই কোরান পড়তেন। গরমের সময়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তিনি একগ্লাস ঠাণ্ডা শরবত খেতেন। এলু জান শুনেছে তিনি শরবতের সঙ্গে মুক্তাভস্ম খেতেন। সন্ধ্যায় কোর্মা কাবাব পোলাও ইত্যাদি কুড়ি থেকে ত্রিশটি পদ পরিবেশন করা হত তাঁকে। তিনি হাত নয়, চামচ দিয়ে খেতেন। প্রত্যেক বার খাবারের পর তামাক সেজে দিতে হত তাঁকে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বেগম গল্প শুনতেন। আমজাদ আলি যখন বেঁচে ছিলেন তখন গল্প-বলিয়ে এসে বসতেন চিকের আড়ালে। তিনি মারা যাওয়ার পর কথক বেগমের খাটের কাছে বসেই গল্প শোনাত। যে ধরনের গল্প বেগম শুনতে চাইতেন তাই শোনাত। মনের মতো গল্প শোনালে পুরস্কার মিলত।

বেগমের স্নান আহার সবই পরব। হারেমে খোজা ছাড়াও সশস্ত্র নারী প্রহরীর দল ছিল। বেগম তাদের মোটে পছন্দ করতেন না। তিনি কোথাও গেলে সঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য এবং পরিচারিকার মিছিল দেখা যেত। বেগম তখন দরবারি পোশাক পরতেন।

আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সেরে এসেই সে সব ছেড়ে দিতেন। তাঁর বাহ্যিক আড়ম্বর ভাল লাগত না। তিনি ছিমছাম পোশাক এবং হালকা রুচিসম্মত গহনা পরতেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর নথ পরা ছেড়ে দেন। বেগমের গহনাপত্র এবং টাকা পয়সা পাহারা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রহরী ছিল। সেই অর্থভাণ্ডারের পাশে আর একটি ঘর ছিল। তাতে একটি বড় কাঠের বাক্স ছিল। আমজাদ আলির বাবার আমল থেকে তাতে মোহর এবং টাকা জমানো ছিল। বেগম সেই পাঁচমিশেলি টাকা-পয়সাকে বলতেন 'খিচুড়ি'। কথা ছিল প্রাসাদে কোনও কারণে খুব অর্থ-সংকট দেখা দিলে তখন এতে হাত দেওয়া হবে।

বেগম দর্শনার্থীদের দর্শন দিতেন দুপুরে খাওয়ার আগে একবার, আর একবার সন্ধ্যার খাবারের আগে। তাঁর কাছে অনেকেই আর্জি নিয়ে আসত। কেউ কেউ আসত নালিশ জানাতে। বেগম সকলের কথাই মন দিয়ে শুনতেন। যা করণীয় বলে মনে করতেন তাই করতেন। বেগমের চরিত্র ছিল যাকে বলে কোমলে কঠোরে। স্বামী আমজাদ আলি একবার বেগমের একজন সুন্দরী পরিচারিকার প্রেমে পড়েন। একদিন দেখা গেল ঘুমিয়ে-থাকা সেই সুন্দরীর মুখ বিস্ফোরণে পুড়ে গেছে। এলু জান মনে করেন এর পিছনে ছিল ঈর্ষাকাতর বেগমের হাত। নবাব আমজাদ আলি নাকি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর বাজারের এক ফুলওয়ালিকে 'মুত্‌আ' বিয়ে করে। বেগমের কাছে অনেকদিন পর্যন্ত খবরটা গোপন ছিল। জানাজানি হয়ে যায় নতুন বেগমের ছেলে হওয়ার পর। বেগম স্বামীকে ব্যঙ্গ করে বলেন—এর পর নবাবের ভৃত্যরা যারা এই ফুলওয়ালির কাছ থেকে ফুল কিনত তারা নবাবকে দেখলে বলে উঠবে—ওই ফুলওয়ালির বর যাচ্ছে। কোথায় থাকবে তখন নবাবের সম্মান! আমজাদ আলি নাকি তাঁর ধিক্কার শুনে মাথা নিচু করে পালিয়ে গিয়েছিলেন বেগম আউলিয়ার সামনে থেকে। বেগম তখন তাঁর পরিচারিকাদের দিকে ঘুরে বলেছিলেন—এর পর আর ইনি এমুখো হবেন না!

আউলিয়া বেগম খানদানি বংশের মেয়ে। তিনি দিল্লির একজন শাহজাদি। সুন্দরী। সুশিক্ষিতা। আরবি ফারসি লিখতে পড়তে জানতেন। আউধের নবাবের সঙ্গে তিনি ঘর করেছেন। আউধের আর এক নবাব তাঁরই পুত্র। এই গর্বিত রমণী প্রাসাদের পক্ষে অসম্মানকর কোনও কিছু সহ্য করতে পারতেন না। স্বামী আমজাদ আলি শাহ যাকে তাকে ঘরে তুলে আনছেন, এ দৃশ্য যেমন তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, তেমনই পুত্র ওয়াজিদ আলি শাহের বাছ-বিচারহীন রমণীপ্রীতিও তিনি অনুমোদন করতে সম্মত ছিলেন না। পরিবারে নিয়ম ছিল, পুত্র কাউকে বিয়ে করলে মায়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য নতুন কনেকে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাবে। আউলিয়া

বেগম কোনও কোনও বিয়ে সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি সবাইকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। শেষ দিকে যখন তিনি দেখলেন পুত্র ওয়াজিদ আলি তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য করছে না, তখন তিনি সবাইকে মেনে নিতে শুরু করেন। তা সত্ত্বেও বিরোধ বেধে গেল ওয়াজিদ আলির প্রধান বেগম খাসমহলের সঙ্গে। খাসমহল নাকি আউলিয়া বেগমের মর্যাদা এবং পরিবারে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঈর্ষাতুর ছিলেন। এলু জানের কাহিনীতে আছে দুই দুইবার বেগম আউলিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। একবার হুঁকোর নলে বিষাক্ত পাউডার দিয়ে, আর একবার তাঁর বিছানার কাছে বিষাক্ত সাপ রেখে। দুই বারই অবশ্য ষড়যন্ত্র বিফলে যায়। আউলিয়ার বিশ্বাস এসব খাসমহলেরই কাজ। শাশুড়ি বনাম বউয়ের এই বিরোধ কলকাতায়ও পৌঁছেছিল।

বেগম আউলিয়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচারিকা ছিল একটি পঞ্জাবি তরুণী। নাম ছিল তার বাহারান্নিসা। অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে। লক্ষ্ণৌতে আসার পর হাফিজ নামে এক তরুণ তার প্রেমে পড়ে যায়। বাহারান্নিসা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকাকে না পাওয়ার শোকে হাফিজ মারা যায়। বাহারান্নিসা তবু নাকি অটল অবিচল। তার আর একটি বোন ছিল। নাম ছিল তার রাসকি আলাম (Rushkee Alum)। সেও খুব সুন্দরী ছিল। ওয়াজিদ আলি তাকে দেখা মাত্র বিয়ে করে হারেমে নিয়ে এলেন। বোন বাহারান্নিসা ঠাঁই পেল আউলিয়া বেগমের কাছে। বেগম তাকে খুবই ভালবাসতেন। সব ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কাজ দেওয়ার সময় তিনি বাহারান্নিসার কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলেন যে, পাঁচ বছরের মধ্যে সে বিয়ে করবে না। বেগম নাকি তাকে মাসে হাজার টাকা বেতন দিতেন। তা ছাড়া নানা উপহার। বাহারান্নিসা সব সময় বেগমের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ফেরে। তারই মধ্যে লক্ষ্ণৌর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জনৈক পিয়ারা সাহেবের সঙ্গে গোপনে ভালবাসার খেলায় মেতে ওঠে সে। বাহারান্নিসা সন্তান-সম্ভবা হয়। গোপন আস্তানায় সে শয্যা নেয়। বেগম উৎকণ্ঠিত। ক্রমে সব কথাই তাঁর কানে আসে। বাহারান্নিসা জানায় পিয়ারা সাহেবের সঙ্গে গোপনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। পুরানো প্রেমিক হাফিজ নাকি মারা যায় এ সংবাদ পেয়েই। বেগমের কাছে সত্য ধরা পড়ে যাবে বলে বাহারান্নিসা সন্তান নষ্ট করে দেয়। বেগম তার জন্য তাকে তিরস্কার করেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সত্ত্বেও আবার বাহারান্নিসাকে ঠাঁই দেন নিজের কাছে। অবশ্য তক্ষুনি নয়, রাগ পড়ে গেলে তবেই। বেগমের কোপে তার আগে পিয়ারা সাহেব নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। বাহারান্নিসাও বিতাড়িত হয়েছিল প্রাসাদ থেকে। ক্রমে দুইয়েরই পুনর্বাসন। বেগম আউলিয়ার সঙ্গে এই বাহারান্নিসা আর পিয়ার সাহেবও এসেছিলেন কলকাতায় বিচারের প্রত্যাশায়।

বেগম আউলিয়া, সন্দেহ নেই, সাহসী রমণী। অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর। অনেক শখ। আবার কিছু কিছু কুসংস্কারও নাকি ছিল এই বেগমের। তাঁর সামনে 'মৃত্যু' শব্দটির উল্লেখ নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবত জীবনকে ভালবাসতেন বলেই তিনি মৃত্যুর কথা শুনতে ভালবাসতেন না। তাঁর বাবা অথবা মা নাকি মারা গিয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে। বেগম আউলিয়া তাই পরিচারিকাদের বলতেন তাঁকে যেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে থাকতে না দেওয়া হয়। সব হারেম সম্পর্কে যা শোনা যায় লক্ষ্ণৌর হারেম সম্পর্কেও সে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল। নবাবদের প্রতি বিশ্বস্ত না-থাকতে পারার জন্য সেখানেও নাকি কোনও ব্যভিচারী বেগমকে জীবিত অবস্থায় দেওয়ালে কবর দেওয়া হয়। বেগম আউলিয়ার কালে অবশ্য সে ধরনের কোনও নৃশংস ঘটনা ঘটেনি। তবু সন্ধ্যার পর বেগম নাকি করিডর বা বাগানের পথ দিয়ে একা হাঁটতে ভয় পেতেন। তিনি নারীকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ শুনতে পেতেন। বেগম স্বপ্নে বিশ্বাস করতেন। ওয়াজিদ আলি রাজ্য হারাবার বছরখানেক আগে তিনি নাকি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখলেন একজন দরবেশের মতো লোক নবাবের দরবারে ঢুকে তাঁকে সিংহাসন থেকে তুলে বাদশাহি গালিচার সীমানার বাইরে মেঝেতে নামিয়ে দিলেন। প্রাসাদের কেউ এই স্বপ্নের রহস্যভেদ করতে পারল না। ডাক পড়ল শহরের বিজ্ঞ বিশারদদের। তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন—সামনেই রাজত্বের সংকট। দান ধ্যান প্রার্থনা—এসব করে সে-বিপদ কাটাবার ফতোয়াও দিলেন তাঁরা। বেগম সবই করেছিলেন। সংকট তবু এড়ানো গেল না।

পুত্রের হাত থেকে রাজত্ব চলে যাওয়ার পরে যেন নতুন আর এক স্বপ্নের ঘোরে আছেন বেগম আউলিয়া। তাঁর পুত্রের মতো তাঁরও ধারণা, ইংল্যান্ডের রানি নিশ্চয় আউধের শাসকের প্রতি অবিচার করবেন না। একবার লন্ডনে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তাঁরা অবশ্যই সুবিচার পাবেন। এই ধারণা থেকেই উট্রামের অনুরোধ রক্ষা করেননি তিনি, পুত্রকে সন্ধিপত্রে সই করতে পরামর্শ দেননি। শোনা যায়, এ জন্য তাঁকে ইংরাজরা সেদিন ঘুষ দিয়ে বশীভূত করার চেষ্টাও করেছিলেন। নবাব-জননী ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে প্রস্তাব। উট্রাম যেদিন দরবারে ওয়াজিদ আলির হাতে সন্ধিপত্র তুলে দেন সেদিনও চিকের আড়ালে বসে বেগম আউলিয়া সেই বিয়োগান্ত নাটকের দর্শক। চোখের জল মুছে তিনি তৈরি হয়েছিলেন পুত্রের সঙ্গে কলকাতা যাত্রার জন্য। এবার তিনি লন্ডনযাত্রী। উট্রামের সঙ্গে তিনি সওয়াল করেছেন লক্ষ্ণৌয়। এবার লন্ডনে গিয়ে সওয়াল করতে চান ইংরাজদের রানির সঙ্গে।

বেগম আউলিয়া যাত্রার জন্য তৈরি হলেন। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন নবাবের আরও দু'জন প্রতিনিধি। একজন ভাই সিকেন্দর হাসমত খান। তাঁকে লক্ষ্ণৌয়

সবাই বলতেন জেনারেল সাহিব। বেগম খুব ভালবাসতেন তাঁকে। দ্বিতীয় ওয়াজিদ আলির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আইনত তাঁর উত্তরাধিকারী কমর কদ্র। কথা ছিল ভূতপূর্ব সহকারী রেসিডেন্ট বার্ড সাহেবও ওঁদের সঙ্গে যাবেন। অচেনা দেশে লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি দলের জন্য যা করণীয় তিনিই সব করবেন। শোনা যায় সে জন্য নবাব নাকি বিস্তর অর্থও দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু বার্ড আগেই কলকাতা ত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ ভাবলেন নবাবকে ফাঁকি দিয়ে বুঝি বা পাখি পালাল! সেটা ঠিক নয়।বার্ড সাহেব নাকি সময়ে ঠিকই হাজির হয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর রাজকীয় প্রতিনিধিদের সামনে। বেগম আউলিয়া জাহাজে ওঠার আগে নবাবের পত্নী খাসমহলের সঙ্গে পুরানো বিবাদ মিটিয়ে নিলেন। খাসমহল নাকি প্রথমে তাঁকে আসতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলেন। বাহারান্নিসা তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বেগমের সামনে হাজির করেন। অবশেষে বিচ্ছেদের আগে দু'জনের মিলন। তারপর নবাব-জননী বিদায় নিলেন নবাবের কাছ থেকে। মাতা পুত্র দু'জনের চোখেই সেদিন জলের ধারা। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে বেগম আউলিয়া অবশেষে জাহাজে চড়লেন। সেই বাষ্পীয় পোতের নাম—'গঙ্গা'। অন্য একটি সূত্র বলছে সে-জাহাজের নাম ছিল—'এস এস রিপন'। বেগমের সহযাত্রী একশ' চল্লিশ জন। সে দলে বাহারান্নিসা এবং তার স্বামী পিয়ারা সাহেব ছিল। এলু জান বলছে সেও নাকি তখন হাজির ছিল জাহাজঘাটায়। মালপত্র তোলা হচ্ছে। হঠাৎ কার হাত থেকে গহনার একটা বাক্স নাকি পড়ে যায় জলে। পিছনে যারা রয়ে গেল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল লক্ষণ মোটেই শুভ নয়।

এ সব ১৮৫৬ সনের জুন মাসের কথা। জাহাজের ভাড়া স্থির হয়েছিল সুয়েজ অবধি। মিশরে ক'দিন কাটিয়ে ওঁরা জিব্রাল্টার হয়ে সাউদাম্পটন পৌঁছলেন। শহরের মেয়র সাদরে সংবর্ধনা জানালেন নবাব-জননীকে। সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডনে। শহরে ওঁরা আস্তানা পাতলেন রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। চার পাঁচটা বাড়ি নিয়ে অনুচর পার্শ্বচরদের সহ সেখানে ছড়িয়ে বসলেন আউধের ভূতপূর্ব বাদশার মা। বোরখা-পরা খোজা প্রহরী পরিবেষ্টিত লক্ষ্ণৌর নবাব-জননীকে উপলক্ষ করে কোনও কোনও কাগজে শুরু হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। 'মর্নিংপোস্ট'-এ একটি কড়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের হল নবাব-জননী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। বক্তব্য: এঁরা কীসের বিচার চাইতে এসেছেন? ডালহৌসি যা করেছেন তা ছাড়া অউধের প্রজাদের রক্ষার কোনও উপায় ছিল কি? সম্পাদকীয়তে এটাও বলা হয় এই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট এবং রানির অনুমোদিত। সুতরাং, তা পরিবর্তিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। 'মর্নিংপোস্ট'-এর উদ্ধত অভদ্র সম্পাদকীয়ের জবাব দিলেন জন ডিভনপোর্ট নামে একজন পত্রলেখক।

বললেন—ইংরাজ কি সামান্য সৌজন্যমূলক ব্যবহারও ভুলে গেছে ! যে কোনও জার্মান রাজকুমার শহরে এলে তাঁকে আপ্যায়নের জন্য শহরে উঁচু মহলে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় । অথচ সেই সব রাজকুমার হয়তো নামেই রাজকুমার, তাঁদের কোনও রাজ্য আছে কি না তার ঠিক ঠিকানা নেই । অথচ সম্পাদক যাঁকে ব্যঙ্গ করছেন তিনি একটি বিশাল সমৃদ্ধ রাজ্যের ভূতপূর্ব শাসকের জননী । জীবনে তিনি সমুদ্র দেখেননি । তাঁর পুত্রস্নেহ এবং সাহসিকতাকেও কি আমরা সম্মান জানাতে অসমর্থ ? তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন আউধের শাসকদের কাছে ইংরাজের ঋণের কথা । —লর্ড আমহার্স্টকে এঁরাই সংকটের সময় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেননি ? তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ইংরাজ রাজপুরুষ, এমনকি সাধারণ ইংরাজ পর্যটকদের প্রতি আউধের শাসকদের উদার আতিথেয়তার কথা । অনেক ভ্রমণকারীর রচনাতেই রয়েছে তার বিবরণ । সম্পাদকীয়ের জবাবে কিছু সরকারি চিঠিপত্র এবং দলিলও উদ্ধৃত করেছিলেন তিনি ইংরাজকে আউধ এবং তাঁর প্রতিনিধিদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য । 'মর্নিংপোস্ট' অবশ্য এ সব চিঠি ছাপেনি । এটি ছেপেছিলেন স্যামুয়েল লুকাস তাঁর বিখ্যাত বই 'ডেকয়টি ইন এক্সসেলসিস'-এ । বেগম আউলিয়া হয়তো তাঁকে ঘিরে এই সব বিতর্ক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না । মুনশিদের নিয়ে রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে বসে তিনি তৈরি করে চলেছেন তাঁর আর্জি ।

এদিকে ওয়াজিদ আলি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় । তিনি তখনও জানেন না, হিন্দুস্তানে হাওয়ার গতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে । আকাশে ঝড়ের সংকেত । আর দেখতে দেখতে সেই ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাবে তাঁর রাজ্য আউধ, রাজধানী লক্ষ্ণৌ ।

অবশেষে ঝড় উঠল । শুরু হল সাতান্নর মহাবিদ্রোহ । বারাকপুর । মিরাট । দিল্লি । লক্ষ্ণৌ । দিকে দিকে বিস্ফোরণ । লর্ড ডালহৌসি আগেই বিদায় নিয়েছেন । এপ্রিলে (১৮৫৬) বিদায় নিয়েছিলেন উট্রামও । তাঁর জায়গায় সাময়িকভাবে রেসিডেন্সিতে বসেছিলেন কোভার্লে জ্যাকসন । তখন আর ওঁরা রেসিডেন্ট নন, নতুন পদবি 'চিফ কমিশনার' । জ্যাকসনকে বেশি দিন লক্ষ্ণৌয় রাখা সম্ভব হয়নি । তাঁর বদলে লক্ষ্ণৌ তথা আউধের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল হেনরি লরেন্সের হাতে । লরেন্স লক্ষ্ণৌ পৌঁছন ১৮৫৭ সনের মার্চের ২৭ তারিখে । মে মাসেই তাঁকে স্বীকার করতে হল—আউধে ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে । 'এভরি আউটপোস্ট, আই ফিয়ার, হ্যাজ ফলেন'—কলকাতায় তাঁর ভয়ার্ত বার্তা ।

স্বভাবতই কলকাতায়ও চাঞ্চল্য । চারদিকে উদ্বেগ, উত্তেজনা । গৃহস্থ বধূ কৈলাসবাসিনী দেবী লিখছেন—"এখন ভয়ানক কাণ্ড কচ্চে, সকল জায়গায় সিপাই খেপে উটিয়াছে, এখন সামাল ২ পড়েছে । ২৮ তারিকে এখানে এমনি ভয় হইয়াছে জে

কি ইংরাজ কি বাঙালি সকলে ভয় পাইয়াছেন। রাত্রে কেউ ঘুময়নি। এর সঙ্গে কতোগুলি দিশি দস্যু মাতিয়াছেন। তাহাতে এখন শহর তোলপাড় হতেছে। কত পাহারা সরগরম। অবেতার পথে ঘাটে সকল জায়গাতে। গউর অবতার, তাদের এখন কিছু বলিবার যো নাই, তারা ভারতের রক্ষা কচ্চেন।” (জনৈকা গৃহস্থবধূর ডায়েরী, কৈলাসবাসিনী দেবী। শারদীয়া এক্ষণ, ১৩৮৮।) ‘হুতোম’ লিখছেন—“সহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্‌রুস, পিদ্‌রুস, গমিস, ডিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গীরে খাবার লোভে ভলিন্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বসলেন, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগলো—আজ দিল্লি গ্যালো, কাল কানপুর হারানো হল, ক্রমে পাশাখেলার হারকেতের মত ইংরাজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো।....”

শহরে সাজ সাজ রব। ১৮ জুন (১৮৫৭) ‘সম্বাদ ভাস্কর’ জানাচ্ছে—“পাইকপাড়া রাজবাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুর আপনারদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারদিগের মধ্যে ৪০/৫০ জন গোরা, অন্যরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলীপোরা বন্দুক রহিয়াছে....। শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটিতে সিপাহিসকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে, মলঙ্গানিবাসী দত্তবাবুদিগের এবং জানবাজারনিবাসিনী শ্রীমতী রানী রাসমনির বাটিতে বাটিতে সৈন্যসকল হৈ ২ থৈ ২ করিতেছে নগরের মধ্যস্থল কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেবাদি প্রত্যেক ধনির বাড়ী ২ দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যরা যুদ্ধোদ্যমে বাদ্যোদ্যম করিতেছে, আমরা তাদৃশ ধনী নহি তথাচ ঢাল তরবার, শড়কী বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রধারী কয়েকজন দেশীয় পাইক রাখিয়াছি, এইরূপ যিনি যেমন মনুষ্য তিনি সেইপ্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সকল প্রজার বাড়ীতেই ছাদের উপর ঝামা ইট কাঁড়ী ২ সাজাইয়াছেন।” প্রস্তুতি-পর্ব এখানেই শেষ নয়। দুইদিন পরে (২০ জুন, ১৮৫৭) ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লিখছে—“কলিকাতা নগরে যেমন পাগলা বাতাস আসিয়াছে, তাহাতে কতকগুলিন সামান্য লোক, যাহারা পিত্তল কাঁসাদি তৈজস বাসন ব্যবহার করে এবং স্ত্রীপুত্রদিগকে সোনা রূপার যৎসামান্য অলঙ্কার দিয়াছে তাহারা ঐ বাতাসে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, বাসনাদি মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে, স্ত্রী পুত্রদিগকে পিত্তলালঙ্কার দিয়াছে, সোনা রূপার অলঙ্কারাদি দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে....।”

শহরের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলল বাজারের অবস্থা। ‘ভাস্কর’ লিখছে—“কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান নগর হইতে (সরকার) সৈন্যগণের আহারীয়

দ্রব্যাদি পাঠাইতেছেন ইহাতেই নগরবাসিরাও খাদ্য দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য করিয়া দিলেন, ধনি লোকেরা মনে করিয়াছেন ইহার পরে খাদ্য দ্রব্যাদি পাইবেন না এই কারণ কোম্পানির কাগজ বিক্রি করিয়াও ছয় মাসের আহারোপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন, ধনিলোকেরাও যদ্যপি ভীত হইয়া বাজার হইতে ছয় মাসের দ্রব্যাদি আগামি ক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন তবে দরিদ্রলোকের কিরূপে রক্ষা পাইবে ? কলিকাতা ইত্যাদি প্রধান ২ নগরে নাই ২ শব্দ উঠিয়াছে, দাইল, তণ্ডুল, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি বস্তু শকল যাহা অধিকসময় গৃহে রাখা যায় ধনি লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন দরিদ্রলোকেরা পাঁচ পয়সাতেও এক পয়সার বস্তু পায় না ; কলিকাতা নগরে কয়েকদিবস আম্র কাঁঠাল সস্তা হইয়াছিল, দরিদ্ররা তাহাই খাইয়া বাঁচিয়াছে, আম্র কাঁঠাল গেল, ইহার পরে তাহারদিগের প্রাণ রক্ষার কি হইবে ?" (সম্বাদ ভাস্কর, ১ জুন, ১৮৫৭) শহরের মহাজনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই কাগজটি গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানিয়েছিল,—"শ্রীযুক্ত লার্ড (ক্যানিং) শ্রীমুখে আজ্ঞা দিবেন মহাজনি কাঁটাসকল এইক্ষণে বন্ধ করিতে হইবে, মহাজনেরা এই সময়ে বাজারে কাঁটা তুলিয়া আর দরিদ্র লোকদিগের গলদেশে কাঁটা ফুটাইতে পারিবেন না, যে-পর্যন্ত যুদ্ধের ধুমধাম থাকিবে ইহার মধ্যে যদি কেহ বাজারে কাঁটা বাহির করেন তবে ঐ কাঁটায় তাঁহারাই কাটা পড়িবেন।" ইত্যাদি।

উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত শহরের এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেলেন অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজিদ আলি শাহও। আচমকা বন্দী করা হল তাঁকে। 'হুতোম' লিখছেন—"লক্ষ্ণৌর বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু'চার বড় ঘরে লুটতরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শালি লা জারি হল।" 'সম্বাদ ভাস্কর' জানাল—"অযোধ্যার বাদশাহ ফোর্ট উইলম দুর্গ মধ্যে কোর্ট মার্সালি বিচারে আসিয়াছেন।" (১৮ জুন, ১৮৫৭) কাগজে হেডলাইন—'অযোধ্যার বাদশাহের কি দুর্গতি।' তারপর পদ্যে খেদোক্তি—'কোথা গেল সিংহাসন কোথা রাজ্যধন।/ অবশেষে ভাগ্যে ছিল নিগড় বন্ধন॥' 'বাদশা'কে গ্রেফতারের বিবরণ দিয়েছে 'ভাস্কর' (১৮ জুন, ১৮৫৭),—"অযোধ্যার শ্রীযুক্ত বাদশাহ গোরা সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হইয়া কলিকাতার দুর্গের মধ্যে আসিয়াছেন, পরদিন তাঁহার পরিবারাদি এবং সহচর লোকেরাও উক্ত দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, গভর্নমেন্ট সন্দেহ করিয়াছেন বাদশাহ সিপাহিদিগের কুমন্ত্রণার মূলীভূত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই কারণ মূল কারণ কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, জনরব এইরূপ—একজন চাপরাসী আসিয়া দুর্গদ্বারের একজন প্রহরীকে কুমন্ত্রণা দিয়াছিল তাহাতে সিপাহী তাহাকে ধৃত করিয়া দিল ঐ চাপরাসীর ফাঁসীর অনুষ্ঠান হইলে সে কহিল এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই, আমি

অযোধ্যা বাদশাহের প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি ইহা বলিয়া একখানা পত্রও দেখাইল ঐ পত্র দেখিয়া তাহার উদ্বন্ধন রহিত করিয়া তাহাকে কারাগারে রাখিলেন এবং ঐ দিবসীয় রাত্রিযোগে বাদশাহের বাসায় এক জাহাজ গোরা সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে গোরা সৈন্যরা বাদশাহকে দুর্গমধ্যে লইয়া আসিল।”

ওয়াজিদ আলি শাহর কোর্ট মার্শাল হয়নি। তাঁর গ্রেফতারের এই কাহিনীটিও পুরোপুরি ঠিক নয়। তবু লক্ষণীয়, ‘সম্বাদ ভাস্কর’ রাজ্যহারা নবাবের প্রতি রীতিমত সহানুভূতিশীল। শহরের তৎকালীন আবহাওয়া এই কাগজটিকে ওয়াজিদ আলিকে ‘ষড়যন্ত্রী’ বলে চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করেনি। তাঁকে তাঁরা বর্ণনা করছেন ‘অযোধ্যার বাদশা’ হিসাবে। নগরের এই সম্ভ্রান্ত অতিথি সম্পর্কে তাঁদের কথাবার্তা রীতিমত সসম্ভ্রম। অভিযোগ সম্পর্কেও সাফ কথা—‘এই কারণ মূল কারণ কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।’ ওয়াজিদ আলি শাহকে গ্রেফতারের পিছনে সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ ছিল না। মনে হয় সন্দেহের চেয়েও সরকারের মনে বেশি ছিল ভয়। রাজ্যহারা বলে কলকাতায়ও তিনি সিপাহিদের ক্ষোভের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। আবার এমনও তো হতে পারে, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার জন্য অপেক্ষা না করেই বিদ্রোহীরা তাঁকে বরণ করে নিতে পারেন নিজেদের নায়ক হিসাবে। সম্ভবত সতর্কতা এ সব সাত পাঁচ ভেবেই।

আমাদের সৌভাগ্য, ওয়াজিদ আলি শাহর হাতে রাজত্ব না থাকলেও তখনও তাঁর মরমি কলমটি ছিল। ফলে ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর এই বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো হারিয়ে যায়নি। ‘হুজনে আখতার’ বা ‘আখতারের বেদনা’ নামে ছোট্ট বইখানার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বইয়ের পাতায় তিনি লিখে রেখে গেছেন কলকাতায় ইংরাজের কেল্লায় তাঁর দুঃখের দিনগুলোর কথা। বইটিতে সিংহাসন হারানো থেকে শুরু করে কলকাতা যাত্রা, মা ভাই এবং পুত্রকে লণ্ডন পাঠানো, পরিবার পরিজনের খবরাখবর, আত্মীয় বন্ধুদের আচার-আচরণ—অনেক মূল্যবান তথ্যই রয়েছে। এমনকি টাকা-পয়সার হিসাবনিকাশ পর্যন্ত। বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে হয়তো নীরস। তবু পড়তে পড়তে বার বার মনে হবে এ-বই একজন স্পর্শকাতর সংবেদনশীল কবির কারা-কাহিনী। —এখানে চাঁদ নেই, সূর্য নেই। বাতাস এ দিকে আসে না। সুহৃদদের এখানে দেখা মেলে না। চেনাজানা কেউ নেই এখানে। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। ধনদৌলত, বিষয়সম্পত্তির প্রতি কোনও লোভ নেই আমার। ওরা আমার ছেলেমেয়ে এবং আপনজনদেরও কেড়ে নিয়েছে। তারা কাঁদছে। আমিও কষ্ট পাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই। খাবার নেই। জল নেই।

অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ মাত্র। তবু, এ ভাষা কি কবির ভাষা নয়?
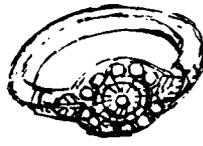
—হে আমার হৃদয়, এবার তুমি তোমার কাহিনী শুরু করো। আমার সব ওলটপালট হয়ে গেছে। মুখের চেহারা পর্যন্ত পাল্টে গেছে। শরীর খারাপ হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত বিরক্তকর হয়ে উঠেছে। আমি অস্থির। আমার চোখে জল। হাতের কব্জি শুকিয়ে গেছে। পাঞ্জায় আর জোর নেই।.... আমি নিস্তেজ। নিজের হাতে খাবার পর্যন্ত মুখে তোলার ক্ষমতা নেই আমার।.... আগে আমার মুখ ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। এখন যেন প্রতিপদের চাঁদ। হাত ছিল আগে নরম। এখন বিবর্ণ কর্কশ।

প্রার্থনা এবং শাকিনামার পর কারাগারে তাঁর দিনগুলোর কথা লিখছেন ভূতপূর্ব বাদশা। আগেই বলেছি, এ-অনুবাদ আক্ষরিক নয়, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ মাত্র। তবু দুঃখী 'আখতার'-এর কাহিনী শোনাবার মতো। তাঁর গ্রেফতারের বিবরণ দিয়েছেন নবাব :

কুঠিতে সেদিন গানের আসর ছিল। মস্ত জলসা। অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল নাচ গান। আসর ভাঙ্গার পর সবাই ঘুমোতে যান। আমিও। আমি গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময় হঠাৎ হইচই, হল্লা। কারা যেন চেঁচাচ্ছে উঠে পড়তে। আমি উঠে পড়লাম। দেখি—ঢেউয়ের মতো চারদিকে গোরা সৈন্য। কেউ বলল—ওরা আমাদের উড়িয়ে দেবে। কেউ বলল—গুঁড়িয়ে দেবে। মাটিতে মিশিয়ে দেবে মুচিখোলা। অনেকে আল্লার দোহাই পাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে ? কেন এই গোলমাল ? একজন এগিয়ে এসে বলল—বাদশা, আলি নকি খানকে ওরা গ্রেফতার করেছে। আমি হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে এলাম। গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি মিঃ অ্যাডিনস্টন। তিনি বললেন—দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। দেরি করবেন না। এটা সরকারের হুকুম। আমি জানতে চাইলাম—কারণ কী ? আমি কী কসুর করেছি তা-ই আমাকে বলুন। তিনি বললেন—সরকার আপনাকে সন্দেহ করছেন। আমি জবাব দিলাম—আমি নির্দোষ। চিরকাল আমি হাঙ্গামা থেকে সরে থাকি। আমি বুঝতে পারছি না কী অপরাধ করেছি। তিনি বললেন—আপনি ষড়যন্ত্রে আছেন। আমি আবার বললাম—এসব গোলমালের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই। আমার অপরাধ কী এখানেই তা প্রমাণ করে ফেলুন। তিনি এ সব কথা শুনতে রাজি হলেন না। বললেন—কে কে আপনার সঙ্গে যাবেন তা-ই বলুন। আমি বললাম—সবাই আমার বন্ধু। সবাই আমার সহযাত্রী হতে রাজি। তিনি বললেন—না, মাত্র আটজন যেতে পারবেন। আপনি নাম বলুন। আমি, আমার সচিব, মুজাহেদউদ্দৌলা এবং

দেয়ানতউদ্দৌলা একটা গাড়ি চেপে বসলাম। ওরা আমাদের কুলিগেটের দিকে নিয়ে চলল।

লন্ডন থেকে তখনও কোনও খবর নেই।

ফোর্ট উইলিয়ামের কুলিগেটের বাড়িতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল আট দিন। তারপর কেল্লার মধ্যেই আর একটা বাড়িতে। সে-বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে নবাব বলেছেন—এখানে আমি নিঃসঙ্গ। কাছেভিতে এমন কেই নেই যাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি। এ বাড়িতে একটা পাখি পর্যন্ত ভেতরে ঢুকতে পায় না। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া শৌচাগার তাঁর ভাল লাগত না। বর্ষার দিনগুলো দম আটকানো। জায়গাটা দুর্গন্ধময়, নোংরা। মশা মাছির দৌরাত্ম্যের কথাও লিখেছেন তিনি। বলছেন—ঈশ্বর জানেন, কী মশাই না আছে এখানে। মারতে গেলে হাতেরও নিস্তার নেই। তার ওপর ছারপোকা।

বন্দী নবাবের জন্য বিধিব্যবস্থা অবশ্যই ভাল ছিল না। তবে আরও খারাপ হলেই বা তিনি আর কী করতে পারতেন? নবাব হয়তো জানতেন না, যে- বাড়িটিতে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেটি গভর্নর জেনারেলদের জন্য তৈরি। অনেক বিশিষ্ট ইংরাজ এ বাড়িতে রাত কাটিয়ে গেছেন। তবে বন্দী হিসাবে নয়, অতিথি হিসাবে। হয়তো তিনি সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর আর এক সিংহাসনহারা নবাবের কথা। তিনি ওয়াজির আলি। আগের শতকে আসফউদ্দৌলার এই পুত্রও দীর্ঘ বন্দীজীবন কাটিয়ে গেছেন কলকাতার এই কেল্লায়। তাঁর রাজ্য হারানোর কথা আগে বলা হয়েছে। ইংরাজরা যখন দেখল হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে যাচ্ছে, ধরে রাখা যাচ্ছে না, তখন মনগড়া একটা ওজর দেখিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল তাঁকে। কৈফিয়ত ছিল—ওয়াজির আলি মোটে আসফউদ্দৌলার বৈধ সন্তানই নয়! রাজ্যহারা ওয়াজির আলিকে প্রথমে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল বেনারসে। বিদ্রোহী ওয়াজির আলি ক্ষিপ্ত হয়ে সেখানে স্থানীয় রেসিডেন্ট জর্জ চেরিকে হত্যা করেন। সেই অপরাধের শাস্তি হিসাবেই ফোর্ট উইলিয়ামে কারাবাস। কেল্লায় একটা লোহার খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছিল তাঁকে। তাতে দীর্ঘ সতের বছর বেঁচে ছিলেন আউধের ভূতপূর্ব নবাব। তারপর ১৮১৭ সনের মে মাসে চিরকালের মতো ছুটি। ১৭৯৫ সনে আসফউদ্দৌলা তাঁর এই পুত্রের বিয়েতে খুবই জাঁকজমক করেছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশি লিখেছেন—সে আড়ম্বর না দেখলে কল্পনায়ও আনা যায় না। তরুণ নবাব এত গহনা পরেছিলেন যে, তার ভারে টালমাটাল অবস্থা। হাতি চড়ে আমরা চললাম মাইল খানেক দূরে একটা বিরাট বাগানের দিকে। সুসজ্জিত বারোশ' হাতি ছিল শোভাযাত্রায়। মাঝখানে একশ' হাতির পিঠে বাহারি হাওদা। হাওদার ওপর জরির ঝালর। তাতে সোনা এবং মণিমানিক্যের কাজ।

....মিছিলে দু'ধারে সওয়ারের কাঁধে চলমান আসরে নেচে চলেছে নর্তকীর দল। ইত্যাদি। আসফউদ্দৌলা এই বিয়েতে খরচ করেছিলেন নাকি ত্রিশ লাখ টাকা। আর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই ওয়াজির আলির শেষকৃত্যের জন্য খরচ করেছিল মাত্র সত্তর টাকা। তার মধ্যে কবরের খরচ—দশ টাকা। কাসিয়াবাগানের গোরস্থানে খোঁজাখুজি করলে এখনও হয়তো সন্ধান মিলবে সেই সমাধিটির।

সে তুলনায় নবাব ওয়াজি আলির জন্য বন্দোবস্ত অবশ্যই অনেক উন্নত। স্বয়ং লর্ড ক্যানিং তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন এই ব্যবস্থা তাঁরই নিরাপত্তার জন্য। বিদ্রোহীরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আপনার নাম করে বেড়াচ্ছে। এসব ভেবেই কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত। নবাবকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন—এতে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না। বিদ্রোহীরা যাতে তাঁর হদিস না পায় তার জন্য বাড়িও পালটে দেওয়া হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—রাজকর্মচারীরা তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখাবে, তাঁর সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখবে। নবাবের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে জন্য সরকারের তহবিল থেকেই তাঁকে দরকারি জিনিসপত্র সব সরবরাহ করা হবে। নবাব এই চিঠির উত্তরে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তখনও তিনি সমান বিশ্বস্ত থাকবেন। ক্যানিং এ চিঠির কোনও উত্তর দেননি। তবে বোঝা যায়, নবাবকে যথাসম্ভব আরামে রাখবার জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছিলেন। ওয়াজিদ আলি নিজেই লিখেছেন—গরমের সময় তাঁকে প্রতিদিন আটসের বরফ সরবরাহ করা হত। তা ছাড়া টানা পাখা ইত্যাদিও ছিল। যে কর্নেলের ওপর তাঁর দেখাশোনার ভার ছিল তাঁরও প্রশংসা করেছেন নবাব। একদিন রাত্রে এক মত্ত ইংরাজ সার্জেন্ট মেজর তাঁর ঘরে ঢুকে নবাবের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। হুমকি দেয় সে নবাবকে খুন করবে। কারণ, বিদ্রোহী সিপাইরা তাঁর বউ এবং ছেলেকে হত্যা করেছে। নবাবের জন্যই এসব হচ্ছে। নবাবকে হত্যা করে সে বদলা নেবে। নবাব পরদিন কর্নেলের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানান। তার কেল্লায় আসা বন্ধ হয়ে যায়। নবাব শুনেছেন তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পিতার হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছিল তার এক পুত্র। নবাব কর্নেল সাহেবকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও প্রহরী তাঁকে বিরক্ত করেনি। নবাবের ব্যক্তিগত পরিচারক পরিচারিকাদের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ সাতজনকে বরখাস্ত করেছিলেন দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য।

নবাব যখন কেল্লায় আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচর। পরদিন আরও অনেককে নিয়ে আসা হয়। নবাব জানিয়েছেন, দাসদাসী অনুচর এবং পরিচারিকাদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় থাকতেন তেত্রিশ জন। তাঁদের অনেকের কথাই

লিখে গেছেন নবাব। তবিবুদ্দৌলা ছিলেন তাঁর হেকিম—চিকিৎসক। তিনি নবাবকে ত্যাগ করে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে চলে যান। মহাতামিমউদ্দৌলা নামে একজন বন্দীজীবন সইতে না পেরে পাগল হয়ে যান। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ শিক্ষক, নবাবের পরম শ্রদ্ধাভাজন ফতেউদ্দৌলা অসুস্থ হয়ে কেল্লাতেই মারা যান। নবাব তাঁর বিশ্বস্ততা দেখে অভিভূত। লিখেছেন তাঁর এক পিসেমশাই মুজাহেদউদ্দৌলা এবং সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব প্রধান মওতামিদ আলি খানও তাঁর অতিশয় অনুগত। মওতামিদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, ইনিও তেমনই আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং শ্বশুর আলি নকি খান সম্পর্কে নবাব বিশেষ কিছু বলেননি। শুধু রাজত্ব হারাবার প্রসঙ্গে বলেছেন—আলি নকি ছিলেন আমার প্রধানমন্ত্রী এবং পরামর্শদাতা। লোকেরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত, কারণ তিনি আমাকে সন্ধিতে সই করতে দেননি। অন্যত্র আলি নকির কলকাতা আসার খবরও উল্লেখ করেছেন মাত্র। অন্য এক সূত্রে জানা যায়—ইংরাজরা সরকারি কাগজপত্র এবং হিসাবনিকাশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তাঁকে লক্ষ্ণৌ আটক করে রাখে। নবাব কলকাতা যাত্রার অনুমতি পেয়েছিলেন অধিগ্রহণের দশ দিন পরে। কিন্তু বহু কষ্টে আলি নকি লক্ষ্ণৌ ছাড়ার অনুমতি পান জুলাই মাসে। ১৫ জুলাই (১৮৫৬) উনিশটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি এবং কুড়িটি গরুর গাড়িতে পরিবার পরিজন এবং মালপত্র নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে যাত্রা করেন। এলাহাবাদ পৌঁছে দলবল নিয়ে তিনি স্টিমার ভাড়া নেন। স্টিমারেই কলকাতা পৌঁছন তিনি জলাইয়ের ২৯ তারিখে। তারপর বছর ঘুরে আসতে না আসতে এই নয়া বিপর্যয়। কলকাতায় নবাবের আগেই ওরা গ্রেফতার করে আলি নকি খানকে।

'আখতার' তাঁর বন্দীজীবনের কাহিনী লিখতে বসে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারক পরিচারিকাদের সম্পর্কেও নানা মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন। লিখেছেন মুহম্মদ শের খাঁ নামে একজন পরিচারক চোপদার বাকর আলির নাক কামড়ে দিয়েছিল। সেই অপরাধে শের খাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। করিম বক্স নামে একটি লোক তাঁকে জল দিত। তার যক্ষ্মা হয়ে যায়। কেল্লা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারবালা নামে একজন পরিচারিকা নবাবকে জল দিত। সেও যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে শুরু করে নবাবের সঙ্গে। জ্বালাতন সইতে না পেরে নবাব তাকে ছাড়িয়ে দেন। লিখেছেন—সাকুল্যে সাত জন কারাগার থেকে চলে যায়।

কারাগারে বসেই নবাব একদিন হাতে পেলেন লন্ডনের চিঠি। দুঃসংবাদ। লিখেছেন—হে আমার কলম, এবার কালো কাপড় অঙ্গে জড়িয়ে নাও। কেন না, দুর্ভাগ্যের রঙ ফুটে উঠেছে। নবাব লিখছেন—চিঠিতে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেলাম।

তিনি দেহরক্ষা করেছেন কয়েক মাস আগেই। রজব মাসে আর এক চিঠিতে জানতে পেলাম ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ। আমি যেন জীবিত থেকেও মৃত। পরের চিঠিতে জানলাম ভাই সিকেন্দর হাসমতের কন্যা রাফত আরা বেগমও নেই। ওঁরা সবাই মারা গেলেন বিদেশ বিভূঁয়ে। মায়ের বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন, ভাইয়ের তিরিশ, ভাইঝির আঠারো।

লন্ডনে মা এবং ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন নবাব। টাকাও পাঠাতেন ওঁদের কাছে। সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে নিশ্চয়ই সে সব খবর জানতেন। কিন্তু 'আখতারের বেদনা'য় তার কোনও বিস্তারিত উল্লেখ নাই। শুধু লিখেছেন—ওই সব চিঠির কথা বলতে গেলে একটা কিতাব হয়ে যাবে। অন্যান্য সূত্র থেকে আউধের এই রাজকীয় প্রতিনিধিদলের পরিণতি সম্পর্কে যা জানা যায় সেও এক ট্রাজেডি। লন্ডনে পৌঁছবার পর ওঁরা রানির সঙ্গে দেখা করার জন্য চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া নবাব-জননীর সঙ্গে নাকি দেখাও করেছিলেন। আউধের প্রতিনিধিদের বলা হয় লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে। পার্লামেন্টে তা নিয়ে আলোচনা চলবে। তারপর যা হয়। ইতিমধ্যে ভারতে মহাবিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ তথা অযোধ্যা দাউ দাউ জ্বলছে। কলকাতায় ওয়াজিদ আলিকে বন্দী করা হয়েছে। সুতরাং, টেমস-তীরেও হাওয়া পাল্টে গেল। হাউস অব কমন্সে আউধের নবাবের তরফে যে আর্জিটি আলোচনার জন্য তোলা হয়েছিল এটা সেটা ওজর দেখিয়ে তা খারিজ করে দেওয়া হল। প্রতিনিধিরা বুঝতে পারলেন পরিবেশ পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে এখানে আর সুবিচার পাওয়ার কোনও আশা নেই।ওঁরা স্থির করলেন মক্কায় তীর্থ করে দেশে ফিরে আসবেন। পথে ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে প্যারিসে শেষ নিশ্বাস ফেললেন নবাব-জননী। বেগম আউলিয়া। নবাবের ভাই 'জেনারেল সাহেব' কাঁদতে কাঁদতে লন্ডনে ফিরে গেলেন। নবাব লিখেছেন তিনিও প্যারিসেই দেহরক্ষা করেন। কিন্তু অন্যান্য সূত্র বলছে 'জেনারেল সাহেবের' মৃত্যু লন্ডনে। স্বভাবতই প্রতিনিধিদল ছত্রভঙ্গ। নবাবজাদা কোনও মতে টাকাপয়সার বন্দোবস্ত করে দেশের দিকে পা বাড়ালেন। এলু জান লিখেছে বেগমের প্রিয় সহচরী বাহারান্নিসা এবং তার স্বামী পিয়ারা সাহেব তীর্থ সেরে ফিরে আসে লক্ষ্ণৌ।

জেলে বসেই নবাব শুনেছিলেন মহাবিদ্রোহের কথা। এক জায়গায় লিখেছেন—আমার এক পুত্রের নাম বির্জিস কদ্র। তার বয়স চৌদ্দ। বেগম হজরত মহল তার মা। তিনি বিদ্রোহের নেত্রী। তিনিই এখন রানি। আর এক জায়গায় লিখেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে লেখা একখানা চিঠির কথা। লিখেছিলেন ওয়াজেদ আলি নামে লক্ষ্ণৌর একজন দারোগা। চিঠির মর্ম : বিদ্রোহীরা এখন অনেকটা দমিত। দারোগা

নিজে অনেক ইংরাজকে বাঁচিয়েছেন। তারা খুশি হয়ে তাঁকে দায়িত্বের কাজ দিয়েছে। তাঁর কাজ এখন বেগমদের তত্ত্বাবধান। একজন নবীনা বেগম নাকি চিফ কমিশনারের মেম এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিব্যি খাতির জমিয়ে নিয়েছেন। বেগম ছোট মহলও অনেককে বাঁচিয়েছেন। দারোগা আরও আটজন মহল তথা বেগমের খবর দিয়েছেন—তাঁরা কুশলেই আছেন। তবে নবাজাদিদের খুবই কষ্টে দিন কাটছে। তাঁদের না আছে জামাকাপড়, না খানাপিনা। তাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন। দারোগা চেষ্টা করছেন তাঁদের এক জায়গায় এনে রক্ষা করতে। দারোগা তাঁদের জন্য নবাবের কাছে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা প্রার্থনা করেছেন। নবাবকে বলেছেন তাঁদের সম্পর্কে চিফ কমিশনারকে চিঠি লিখতে। দারোগা আরও জানিয়েছেন আটজন মহলেরই সব মালপত্র কোতোয়ালিতে আটক করা হয়েছে। তবে সে সব কিছুতে সিলমোহর লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। অচিরেই সব জিনিসপত্র ফেরত পাওয়া যাবে। দারোগা জানিয়েছেন লক্ষ্ণৌর যিনি বড় সাহেব তিনি খুবই হৃদয়বান। তিনি যেন গভর্নর জেনারেলকে তাঁর পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য চিঠি লেখেন।

এই সব দুঃসংবাদ চঞ্চল করে তুলছে নবাবকে। জেলখানা অসহ্য ঠেকছে তাঁর কাছে। গভর্নর জেনারেল তাঁর সঙ্গে গদিয়ান-বাদশার মতোই ব্যবহার করেছন বটে, তবুও নবাবের শান্তি নেই। নানা ব্যাপারে বিরক্ত তিনি। একদিন গোপনে তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত চিঠি। চিঠিটা কেল্লার পাহারাদারের হাতে ধরা পড়ে গেল। তাই নিয়ে অশান্তি। তাঁর খাবার আসত মেটিয়াবুরুজের বাড়ি থেকে। দিনে দু'বার। পাহারাদাররা ডেকচি পরীক্ষা করত। বন্দীদের মধ্যে মাত্র আঠারোজন তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতেন। অন্যরা অন্যত্র। ঝাড়ুদার, বাতিওয়ালা, পানিওয়ালা সকলের ওপরই খবরদারি করে প্রহরীরা। প্রত্যহ রাত্রে বন্দীদের মাথাগুণতি করে দেখা হয়। বিরক্তিকর পরিস্থিতি। নবাব লিখেছেন আমার হুকুমদার ছিল হাজার হাজার সৈনিক আর ভৃত্য। সাতশ' নবিশ ছিল আমার, পাঁচশ' হেকিম, পনেরশ' চোপদার। আর, আমি এখন কয়েদির দলে পড়ি—তারই মধ্যে যথাসম্ভব নবাবি চালে চলছিলেন তিনি। জেলখানায় বসেই হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন একে তাকে। বিশেষত বেগমদের। লন্ডনে টাকা পাঠিয়েছেন দু'বার। একবার ৪৫,৪০০ টাকা। আর একবার ৭৯,৩০০ টাকা। লিখেছেন—তিনি আর বাদশা নন, হাতে তাঁর যথেষ্ট টাকাও নেই। খরচপত্র যা করছেন তা দান নয়, বখশিসও নয়। নেহাত কর্তব্যপালন। জেলখানায়ও হাজার চারেক টাকা খরচ করেছেন তিনি। দান খয়রাত করতে পেরেছেন মাত্র ৬৩০ টাকা। ভৃত্যকুলের মাইনে দিতে চলে গেছে ১০,০০০ টাকা। নবাব জানাচ্ছেন হাতে লাখ টাকার মতো সোনাদানা আছে, তা-ও খরচ করব।

ভাবনা তাঁর টাকা-পয়সা নিয়ে নয়, এই কারাজীবন নিয়ে। যাদের তিনি নিমেষের জন্যও দৃষ্টির আড়াল করতেন না তারা এখন এই উঁচু দেওয়ালের বাইরে। 'আখতার' লিখছেন—এ তো ঘর নয়, বিরহের অনন্ত সাগর। তরুণ এখানে বৃদ্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে বিরহকাতর তিনি প্রিয় বেগমদের জন্য। বেগমদের সংখ্যা বলেছেন তিনি ষাট থেকে সত্তর জন। তাঁদের মধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ছয় সাত জন। কেল্লায় নবাবের সঙ্গে বাস করার অনুমতি পাননি। 'আখতার'-এর কলমে অতএব ঘুরে ঘুরেই আসে প্রিয় সঙ্গিনীদের কথা।

খবর এল আখতার বেগম একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। মন্ত্রী আলি নকি যাঁর পিতা তিনি নবাবের দ্বিতীয় পত্নী। প্রথম পত্নী আলি নকির এক ভাইঝি। তিনি বেগম খাস মহল। লক্ষ্ণৌয় নাকি গুজব ছিল আলি নকি নবাবকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটছেন। সেই ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যই নবাব বিয়ে করেছিলেন মন্ত্রী-কন্যাকে। স্লিম্যান লিখেছিলেন—এবার নিজের স্বার্থেই নবাবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আলি নকিকে। মনে হয় না, এ সব খবর ঠিক। কেন না, আখতার বেগমের পুত্রলাভের সংবাদ পেয়েই তাঁর রূপবন্দনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন কবি।—তিনি ফুল। তিনি ময়ূরী। ফলের মতো রক্তিম আভা তাঁর মুখে। পরিরা পর্যন্ত ঈর্ষা করে তাঁকে। তাঁর মাথায় কালো সাপের মতো চুলের কিলবিল। দাঁতে হীরে মুক্তোর ঝিলিক। তিনি গাছের মতো সরল। ইত্যাদি। নবাব বলছেন—তাঁর বয়স সবে সতের। আর তাঁর নিজের বয়স তেত্রিশ।

আর যে সব বেগমের কথা তিনি বলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—শাহজাদার জননী বেগম খাস মহল, বেগম মাল্‌কা-ই-মুলুক, বেগম মহবুব-ই-খাস, জানে জান্‌, বেগম মুমতাজ আলম, কাইজার বেগম, বেগম খুজিস্তা মহল, এবং জাফরি বেগম। কাইজার বেগম সম্পর্কে তিনি লিখছেন—তিনি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নন। স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি নবাবের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা এসেছিলেন। কিছুদিন পরে আবার ফিরে যান লক্ষ্ণৌ। জাফরি বেগমের রূপও কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি। তাঁর জন্য তিনি নাকি সব ছাড়তে রাজি, এমন কি ফিরদৌসির কবিতা পর্যন্ত! সে বেগম পান সেজে পাঠান তাঁকে জেলখানায়। আবার এক একসময় খবর পাঠান—তাঁর হাত ক্লান্ত, তিনি আর পারছেন না!

ছেলেমেয়েদের কথাও লিখেছেন নবাব। লিখেছেন তাঁর আটটি পুত্র আর পাঁচটি কন্যা। নাইটনের বইয়ের ইংরাজ সম্পাদক 'তারিখ ই আউধ' উদ্ধৃত করে লিখেছেন ওয়াজিদ আলি শাহের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র এবং চৌত্রিশটি মেয়ে ছিল। নবাব কিন্তু বলেছেন মাত্র তেরোজনের কথা। তাদের কার মা কে, তখন তাঁরা কোথায় তারও হদিস দিয়েছেন। বলেছেন, ছেলেদের কেউ লন্ডনে, কেউ লক্ষ্ণৌয়, কেউ মুচিখোলায়। তাঁদের

সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন নবাব। বলছেন—আমি যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। তবে সবচেয়ে ব্যাকুল যেন তিনি রমণীসঙ্গের জন্য। ব্যাকুল নাচগানের জন্য। লক্ষ্ণৌর দারোগার চিঠি পাওয়ার পর খুজিস্তা মহলের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবার আবাহন করেছেন শাকিকে।—সঙ্গীতজ্ঞরা কোথায় ? কোথায় তাম্বুরা ? কোথায় সুরশৃঙ্গার ? কোথায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরীরা ? কিছু টপ্পা গায়ককে নিয়ে এসো, কিছু খেয়াল গায়ককে। গজল আর ঠুমরি গায়করাও আসুক ! পুরো দুটো অনুচ্ছেদ লিখেছেন তিনি কল্পনার নাচ-গানের আসর নিয়ে। জীবন্ত ছবি। লিখছেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন নাচ-গানের পরিবেশ পাই। যেন প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমাকে আর সহ্য না করতে হয়।—হায়, এক প্রেমিক পড়ে আছে কারাগারে !

ওয়াজিদ আলির মতো প্রেমিক বোধহয় দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। লক্ষ্ণৌর নবাবরা অনেকেই রমণীবিলাসী ছিলেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলি শাহর তুলনা নেই। তাঁর লেখা অনেক বইয়ের আর একটি—'তারিখ-ই-পরিখানা।' অবিশ্বাস্য সারল্যের সঙ্গে এ বইয়ে ওয়াজিদ আলি বিবৃত করে গেছেন তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোর কথা। প্রসঙ্গত তাও শোনার মতো।

নবাব লিখেছেন তাঁর যৌনজীবনের সূচনা আট বছর বয়সে। তাঁকে এই লীলায় প্রথম দীক্ষিত করে প্রাসাদের এক বয়স্ক রমণী। শিশু ওয়াজিদ আলির সেবাযত্ন করার ভার ছিল তার ওপর। তারপর বয়স কিছু বাড়লে মায়ের পরিচারিকা আমিরনের সঙ্গে গোপন মহব্বত। তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এগারো বছর বয়স পর্যন্ত। নবাব সোজাসুজি বলেছেন—এগারো থেকে তিনি নিজে উড়তে শেখেন। প্রথমে বান্নু নামে মায়ের এক পরিচারিকার সঙ্গে। সে তাঁকে এড়িয়ে চলত। তারপর হারেমে কাজ করতে এল তার এক বোন,—হাজি খানান। বিবাহিতা। তাকেও পেতে চাইলেন তরুণ ওয়াজিদ আলি। ওদের এক আত্মীয়া ছিল ইমামি খানা। নবাব তাকে দূতী নিয়োগ করলেন। খানান ধরা দিল তাঁকে। এরপর এল ইলাহি খানান নামে আর এক পরিচারিকা। ওয়াজিদ আলি তাকেও প্রেমের বাঁধনে বাঁধলেন। বিদায়ের সময় এই মেয়েটিকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন আংটি আর হাতির দাঁতের চিরুনি।

তারপর পনেরো বছর বয়সে শুরু হল বিয়ের কথাবার্তা। একের পর এক কনে বাতিল করে দেন ওয়াজিদ আলি। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল। মাস পাঁচেক তৃপ্ত ছিলেন তিনি। তারপর শুরু হল আবার ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো। ওয়াজিদ আলি হারেমের পরিচারিকাদের উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। বেগম জানতে পেরে তাঁর ওপর পাহারা বসালেন। কিন্তু তাঁকে বশে রাখা খুবই কঠিন কাজ। ওয়াজিদ আলি মোতি খানম নামে এক সুন্দরীকে নিযুক্ত করলেন তাঁর পরিচারিকা। মেয়েটি নাকি নাচত ভাল। বেগম হল্লা

বাধালেন। আবার নজরবন্দী হলেন তিনি। ইতিমধ্যে তিনি একাধিক সন্তানের পিতা হয়েছেন। কিন্তু ভোগবাসনা তাঁর বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং বেড়েই চলেছে। মোতিকে নিয়ে কবিতা লিখলেন তিনি। স্ত্রীর সঙ্গে বলতে গেলে প্রায় আড়ি দিয়ে দিলেন। বেগম তাঁর অভিমানের হেতু জানতে চাইলেন। ওয়াজিদ আলি নির্বাক। বেগম তাঁর মনের কথাটি বুঝে নিলেন। বললেন—ঠিক আছে। আপনি প্যার করুন, আমি কিছু বলব না! আপস হয়ে গেল।

ছাড়পত্র পেয়ে ওয়াজিদ আলি প্রথমে ঝুঁকলেন বাবার এক পরিচারিকা সাহেব খানমের দিকে। নবাবের বয়স তখন আঠারো। সাহেবের বয়স বত্রিশ। সে গাইতে পারত। তবে বিবাহিতা। ওয়াজিদ যখন তার প্রেমে হাবুডুবু তখন তাঁর চোখে পড়ল আর এক রমণী উমদা বেগম। দু'জনের মধ্যে নবাবের ভালবাসা নিয়ে রেষারেষি। কাড়াকাড়ি। তারপর তাঁর জীবনে এলেন সরফরাজ বেগম আর নান্নি বেগম নামে দুই প্রণয়িনী। এঁদের মধ্যে নান্নি বিধবা ছিলেন। এঁদের তিনি হারেমে ঠাঁই দিয়েছিলেন। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি উমদা বেগমকেও। নবাব লিখছেন বিয়ের পর নান্নি তাঁকে খুশি রাখতে পেরেছিলেন মাত্র পনেরো দিন! এঁদের পর তাঁর জীবনে এল বাইজি ওয়াজিরান। সুন্দরী অষ্টাদশী। সেই সঙ্গে প্রাসাদে নিযুক্ত হল অষ্টাদশ সুন্দরীর এক বাহিনী। প্রাসাদের বয়স্কা দারোগা নাকি নবাবের মন বুঝেই এই আয়োজনটি করেছিলেন। এতেও তৃপ্ত নন নবাব। তিনি আশমন আর এমারন নামে দুই গায়িকা বোনের প্রেমের পড়ে গেলেন। তাঁর বয়স তখন মোটে বাইশ। প্রাসাদের সেই অষ্টাদশ সুন্দরী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন কিছুদিনের মধ্যেই আমি তাদের কথা বিলকুল ভুলে যাই। তাঁর নেশা তখন গাইয়ে নাচিয়ে 'পরি'রা। তাদের নিয়েই তাঁর 'পরিখানা।' লিখেছেন—মন্দ কী, একশ' বেগম আর পরিদের স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হল। লিখেছেন—আমি প্রেম-পাগল।

কারাজীবন অতএব তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকবে বইকি! প্রেমিক ওয়াজিদ আলির পরিচয় রয়েছে আরও একখানা বইয়ে। সে বইখানার নাম—'তারিখ-ই-মুমতাজ।' বিলাতে উইন্ডসর ক্যাসলে তাঁর লেখা আরও একটি বাহারে চিত্রিত বই রয়েছে। নাম—'নিজাম ইসাকনামা।' লেখক—সুলতান আলম। বইটি বিদ্রোহের পর লক্ষ্ণৌর বাদশাহি গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা। এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়ও নবাবের প্রেমপ্রণয়। বইটি আমরা দেখার সুযোগ পাইনি। 'তারিখ-ই-মুমতাজ'-এর পাণ্ডুলিপিও রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। এই পুঁথিটিও নাকি চমৎকার অলঙ্কারে সাজানো। সৌভাগ্যবশত সে পত্রগুচ্ছ এদেশে লভ্য। 'হুজনে আখতার', 'তারিখ-ই-পরিখানা' এবং 'তারিখ-ই-মুমতাজ' তিনটে বইয়েরই বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এক সময়।

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৭৪—)। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ দিচ্ছি মাত্র। 'তারিখ-ই-মুমতাজ'-এ নবাব প্রেমের চিঠিগুলো লিখেছিলেন বেগম আকলিল মহলকে। তিনি নবাবের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে আসেননি। নবাব তাঁকে স্মরণ করেছেন কলকাতায় বসে। প্রথম চিঠির তারিখ ৯ জুলাই, ১৮৫৬। শেষ চিঠির ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯। মাঝখানে অবশ্য দু' বছরের যতি। প্রথম পর্বের চিঠি আছে নয় খানা, দ্বিতীয় পর্বের কুড়িখানা। সব চিঠি, বলা দরকার জেলখানায় বসে লেখা নয়। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মনেই হয় না এই প্রেমিকপুরুষ হারেমের অধীশ্বর। অসংখ্য সুন্দরী প্রহর গোনে তাঁর অপেক্ষায়। যেন কোনও দুঃখী গৃহস্থ চিঠি লিখছেন তাঁর প্রিয়তমা গৃহিণী সচিব এবং সখাকে। প্রথম চিঠিতেই ওয়াজিদ আলি জানাচ্ছেন যদিও আল্লার দয়ায় তিনি নিরাপদে কলকাতা পৌঁছেছেন, তবু উদ্বেগ কাটছে না। কেন না, শত্রুরা ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। অনিষ্ট করার কোনও সুযোগ পেলে তারা ছাড়বে না। 'হুজনে আখতার'-এর পাতায় ক্ষোভ আছে, কিন্তু রোষ নেই। এই পত্রাবলির প্রথম চিঠিতেই দেখা যায় ওয়াজিদ আলি সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ইংরাজের বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছেন—যারা আমার মহল ধ্বংস করছে ধ্বংস হবে তারা নিজেরাও। আল্লা তাদের নিপাত করবেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার লক্ষ্ণৌর নবাবদের মধ্যে ওয়াজিদ আলি শাহই প্রথম প্রেমপত্র-লেখক নন। বেগম মালকা জামানির লেখা নবাব নাসিরউদ্দিন হায়দারের পত্রাবলিও পাওয়া গেছে। মালকা জামানিও সুন্দর চিঠি লিখতেন নবাবকে। ওয়াজিদ আলির কোনও কোনও চিঠিও 'জবাবি', অর্থাৎ, বেগমের চিঠির জবাবে লেখা।

সব মিলিয়ে ঊনত্রিশখানা চিঠি। দ্বিতীয় চিঠিতে কলকাতাকে বলেছেন তিনি মরুভূমি। হৃদয়ে তাঁর বিরহের ক্ষত ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। তৃতীয় চিঠিতে জানা যায় বেগম নবাবের প্রতি তাঁর ভালবাসা জানিয়ে চিঠি লিখছেন। তাঁকে একখানা তাবিজও পাঠিয়েছেন। ওয়াজিদ আলি সেটি হাতে পরেছেন। চতুর্থ চিঠিতে আকলিল মহলের রূপের অনুপম বন্দনা। প্রেমিকের কাছে তিনি যেন ফাঁসিকাঠ। তাঁর চোখ দুটি যেন মদিরার ভাণ্ডার, আর সে কারণেই দুনিয়ার সুরার দাম বাড়তে পারছে না! ইত্যাদি। প্রতিটি চিঠিতেই নবাব যেন এক রোমান্টিক কবি। কোনও চিঠিতে তিনি সই করছেন 'জানে আলম' বলে, কোনওটিতে 'সিকেন্দর ঝা আখতার', কোনওটিতে 'পরির আখতার', আবার কোনওটিতে 'মিলনের জন্য ব্যাকুল, আর্ত ও বিপর্যস্ত জানে আলম।' একটি চিঠিতে জেলখানার খবরাখবরও রয়েছে। লিখেছেন—আঠারো মাস ইংরাজের কেল্লায় বন্দী তিনি। তিনি নিঃসঙ্গ। বিরহ দগ্ধ করছে তাঁকে। আকলিল মহল তাঁর সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে চান। কিন্তু নবাব লিখছেন, কেমন করে তার ব্যবস্থা করবেন

তিনি ? এখানে একটা পাখি পর্যন্ত আসতে পারে না। প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, লাটসাহেব তাঁকে দুই লাখ টাকা দিয়েছেন। কথা দিয়েছেন দরবার হলে আরও দেবেন। আকলিল মহলকেও পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে চিঠির মধ্যেই উপহার পাঠিয়েছেন নিজের লেখা গজল। এ চিঠি বেগমের হাতে পৌঁছায় সরকারের বৈদেশিক দফতরের হাত হয়ে।

কিছু চিঠিতে টাকাপয়সার কথা আছে। সাংসারিক কথা। কিন্তু অধিকাংশ চিঠিতেই প্রেমের অর্ঘ্য। ফাঁকে ফাঁকে নিজের লেখা পদ্য। আকলিল গান গাইতে ভালবাসেন, আখতার তাই গজল লিখে পাঠাচ্ছেন তাঁকে। একটি চিঠিতে নবাব ফার্সিতে একটি পদ লিখে তা পূরণ করতে অনুরোধ করেছেন এই প্রিয় বেগমকে। বেগম চিঠি লেখাতেন মুনশিকে দিয়ে। নবাব লিখছেন—লিপিকারের নাম লিখে দিও। আমাদের প্রেমপত্র যখন বই হবে তখন তাতে তার নাম দেব। তাঁকে আমি খেতাব দেব—রাকিম-ই-ইদক-ই-আখতার। তিনি মনে করেন বেগমের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের উপাখ্যান পাঁচশ' থেকে ছয়শ' পদে রচিত হতে পারে। তাঁর ইচ্ছা সেই মনসবি-সংকলনের নাম হবে—'কিতাব-ই-মনসবি।' নবাবও সাধারণত নিজের হাতে লিখতেন না। তাঁর লিপিকর ছিল। শুয়ে শুয়ে তিনি বলে যেতেন লিপিকর লিখে নিত। তা পদ্যের বই হোক; আর প্রেমপত্রই হোক। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—তিনি তাঁর কবিতা সংকলন করছেন। হাতে সময় নেই। সে জন্য আর একজনকে নির্দেশ দিয়েছেন বেগমকে চিঠি লেখার জন্য। সে চিঠি অবশ্য তিনি নিজে দেখে দিয়েছেন। যতদিন তিনি কাব্য-সংকলন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ততদিন তিনি নিজের হাতে বেগমকে চিঠি লিখতে পারবেন না। বেগম যেন মনে না করেন তাঁর প্রেমে ভাটা পড়ে গেছে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার তিনি লিখবেন। 'তারিখ-ই-মুমতাজ' সংকলনের কথাও আছে চিঠিতে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ চিঠিতে পুনর্মিলনের বাসনা। নবাব লিখছেন—তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তিনি অস্থির। অচিরেই যেন দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। তবে তিনি কোনও জোর জবরদস্তি করবেন না। বেগম মুক্ত। যা তাঁর অভিরুচি।

নবাব কিছুটা অভিমানী যেন। এই অভিমান ফুটে উঠেছে কারাগারে বন্দী 'আখতারে'র জবানবন্দিতেও। 'হুজনে আখতার'-এ তিনি লিখেছেন—যদি কেউ শতবর্ষ ধরে কারও জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে তবু লহমায় সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হতে পারে। তাঁর কিছু আশাভঙ্গের কাহিনীও শুনিয়েছেন নবাব। ইংরাজ নয়, তাঁকে আশাহত করছেন তাঁর প্রেমিকারা। কারাকাহিনী লিখতে বসে সে দুঃখের কথাও ভুলতে পারছেন না নবাব। বর্ণনা করেছেন তাঁদের হৃদয়হীনতার উপাখ্যানও।

বেগম খুজিস্তামহল তাঁর সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন। নবাব বন্দী হওয়ার পর তাঁর ভাল লাগছিল না। কারাগারে নবাবকে তিনি নিজের একখানা দোপাট্টা উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতি। নবাবের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন আপন অঙ্গের পোশাক। নবাব তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন। কিন্তু দু'দিন পরেই ফেরত এল উপহারের ডালি। নবাব শুনলেন তিনি অন্য একজনের বাড়িতে চলে গেছেন। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন কারবালা। নবাব সখেদে লিখেছেন—দুঃখের দিনে কেউ সঙ্গে থাকে না।

নালিশ তাঁর আরও কোনও কোনও বেগম সম্পর্কে। জাফরি বেগম সাত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জেলখানা থেকে মাঝে মাঝে তিনি চেয়ে পাঠাতেন জাফরি বেগমের মুখের তাম্বুল। নবাব একবার তাঁর কাছে একখানা দোপাট্টা এবং আরও কিছু কিছু ভালবাসার স্মারক চেয়ে পাঠান। রূঢ় জবাব আসে জাফরি বেগমের কাছ থেকে—নবাব বরং অন্য কারও কাছে চান। যাঁকে টাকা দিচ্ছেন, যাঁর কাছে বাঁধা পড়ে আছে আপনার মন। আর এক বেগমের কাছে তিনি পায়ের নখ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর উত্তর—আমি নাপিতানি নই। সেই সব রমণীদের কাছে নখ চেয়ে পাঠান যাঁরা আপনার প্রেমে মাতোয়ারা। যাঁরা আপনার গোপন কথা জানে। দিলদার বেগমের কাছে তিনি মিসি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। অসুস্থতার ওজর দেখিয়ে তিনিও পাশ কাটিয়ে গেলেন। কাইজার বেগমের সঙ্গে তাঁর তেরো বছর ধরে সম্পর্ক। নবাব তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর পায়ের একটি আংটি। কাইজার তাঁকে নিরাশ করেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন—আমার পায়ে কোনও আংটি নেই। অনেকেই আহত করছেন প্রেমিক নবাবকে। বলছেন আমার বন্দীজীবনেও বন্ধুত্ব অম্লান রেখেছেন একমাত্র আখতার মহল। তিনি রোজ তাঁকে খানা পাঠান, আর পাঁচখানা করে পান। তিনি তাঁর একগুচ্ছ কেশ উপহার পাঠিয়েছেন তাঁকে। নবাব বলছেন—আমি তা যত্ন করে রেখে দিয়েছি আমার বুকের কাছে!

'হুজনে আখতার' শেষ হয়েছে বন্দীর করুণ প্রার্থনা দিয়ে। নবাবের একমাত্র প্রার্থনা—কারগার থেকে মুক্তি। পূর্ণ মর্যাদা সহ। হিন্দুস্তানের সবাই সুখে থাক, নবীনদের শ্রীবৃদ্ধি হোক! এই কথা বলেই তাঁর মসনবি শেষ করছেন কবি 'আখতার'। বন্দী নবাব।
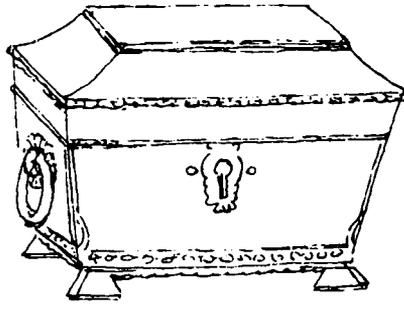
ওয়াজিদ আলি ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী ছিলেন ১৮৫৭ সনের জুন থেকে ১৮৫৯ সনের জুলাই অবধি। তারপর ছাড়া পেয়ে আবার মেটিয়াবুরুজে। ইতিমধ্যে মহাবিদ্রোহের আগুন প্রায় পুরোপুরি নিভে গেছে। কোম্পানির বদলে সরাসরি নিজের হাতে রাজত্ব তুলে নিয়েছেন রানি ভিক্টোরিয়া। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসছে দেশে। ওয়াজিদ আলি শাহ তার আগেই জেনে গেছেন রাজ্য ফিরে পাওয়ার কোনও আশা নেই। লন্ডন-দৌত্য ব্যর্থ। লন্ডনে তখন সৈয়দ আবদুল্লা জইসি নামে লক্ষ্ণৌর একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। নবাবকে তিনি চিঠি লিখলেন—তিনি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন রানি ভিক্টোরিয়া গভর্নর জেনারেলকে বলেছেন নতুন করে সন্ধিপত্র লিখতে। নবাবের কাছে এমন একটি দলিল যেন পেশ করা হয় যাতে তিনি সুবিচার পান। জইসি নবাবকে জানিয়েছেন—গভর্নর জেনারেল অচিরেই নবাবের কাছে চিঠি লিখবেন। নবাবের বুঝতে বাকি রইল না এই সব কথাবার্তা নিতান্তই কাল্পনিক। লোকটি তাঁর সঙ্গে খাতির করতে চায়। চিঠির জবাবে তিনি তাঁকে খেতাব দিলেন—সালা-উদ-দৌলা। অর্থাৎ, রাজকীয় উপদেষ্টা। সেই সঙ্গে জইসির নাম এবং নতুন পদবি খোদাই করে একটা সিলমোহরও পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কাছে। জইসি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন নবাবের এই রসিকতার অর্থ।

দিনবদলের সব সম্ভাবনা অলীক হয়ে যাচ্ছে। নবাব অতএব নিজেই লন্ডনের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন তিনি আপিল তুলে নিচ্ছেন। আবদুল হলিম 'শরর্' লিখেছেন—কারাগারে বসেই তিনি তা তুলে নেন। ব্রিটিশ সরকার নাকি নবাবের মামলা মুলতবি রেখেছিলেন। কৈফিয়ত ছিল, নবাব যে রাজত্ব ফেরত চাইছেন তা আর ব্রিটিশের হাতে নেই। বাদশা নিজে যখন মামলা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন তখন আবার আপত্তি তুললেন তাঁর লন্ডনস্থ 'মুখতার-এ-আম' বা আইন বিষয়ক প্রতিনিধি মসিহ্উদ্দিন খাঁ। তাঁর নাকি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল রাজ্য ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু কেল্লায় বাদশাহের কাছাকাছি পরামর্শদাতারা বললেন—তা কি কখনও হয়? রাজত্ব

কেড়ে নেওয়ার পর কেউ কি আবার তা ফেরত দেয় ? তাঁরা নিজেদের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। বাদশার হাতে তখন টাকাকড়ি কম। তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর অনুচর পার্শ্বচরদের কষ্ট লাঘব করার জন্য গভর্নর জেনারেলকে লিখে পাঠালেন—ঠিক আছে, আমি পেনশন নিতে সম্মত। এই সঙ্গে মামলাও তুলে নিচ্ছি। সরকার রাজি হয়ে গেলেন। তবে শর্ত সহ। প্রথমত, বকেয়া পেনশন তাঁকে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, কর্মচারীদের জন্য বছরে যে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছিল তাও বন্ধ। পারিষদরা বললেন—তা হোক। তবু পেনশন নিয়ে নেওয়াই সঙ্গত। বিলাতে এই খবর শুনে মসিহ্উদ্দিন খাঁ স্তম্ভিত। তাঁর সব চেষ্টা কি তবে বিফলে যাবে ? তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আর্জি পেশ করলেন—বাদশা এখন ইংরাজ সরকারের হাতে বন্দী। এমন অবস্থায় তাঁর কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিলাতের কর্তৃপক্ষ নাকি এই আপত্তিও মেনে নেন। ততদিনে ওয়াজিদ আলি শাহ ছাড়া পেয়েছেন। মসিহ্উদ্দিন তবু মামলা ছাড়ছেন না। মেটিয়াবুরুজে তাঁর সভাসদরা বলতে লাগল—হুজুর, এটা কি ঠিক হচ্ছে ? বিলাতে মসিহ্উদ্দিন এখনও নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, আপনি বন্দী ছিলেন বলেই পেনশন গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। বাদশা বললেন—তা কেন ? তিনি আবার চিঠি লিখলেন রাজসরকার বরাবরে—আমি স্বেচ্ছায় পেন্শন গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছি। কয়েদ থাকা কালে কারও জবরদস্তিতে নয়। মসিহ্উদ্দিনের বিবৃতির কোনও মূল্য নেই। তাঁকে আমি এই সঙ্গে মোক্তারের পদ থেকেও বরখাস্ত করছি। ব্যস, সব গোলমাল মিটে গেল। রাজত্বের বিনিময়ে বছরে বারো লাখ টাকা ভাতা গুনে দিয়েই অযোধ্যার নবাবের প্রতি তাঁদের সব দায়দায়িত্ব চুকিয়ে দিলেন ইংরাজ সরকার। সেই সঙ্গে অবশ্য ওয়াজিদ আলি শাহকে ফেরত দেওয়া হল বাজেয়াপ্ত করা রাজকীয় গহনাপত্র। তার মূল্য সেকালের হিসাবে প্রায় ষাট হাজার পাউন্ড। তাই নিয়ে অযোধ্যার শেষ নবাব আবার নতুন করে শুরু করলেন তাঁর জীবন। আবার সেই নবাবিয়ানা। মেটিয়াবুরুজে যেন লক্ষ্ণৌর সূর্যাস্তের আভা। সেই নাচগান কবিতা। সেই ইমারতের নেশা। সেই চিড়িয়াখানার আর বাগবাগিচা। মেটিয়াবুরুজ যেন গৌরবের দিনের লক্ষ্ণৌরই প্রতিচ্ছবি।

হঠাৎ যেন ওয়াজিদ আলির হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল গার্ডেনরিচের। অষ্টাদশ শতকে শহরতলির এই এলাকা ছিল রীতিমত সমৃদ্ধ। নদীর ওপারে কর্নেল কিড সাহেবের বাগান। এবং সেই বাগানের সূত্রেই গার্ডেনরিচ। কিডের বাবা আর এক কিডও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর নামেই খিদিরপুর। বাগান অবশ্য এপারেও ছিল একটি। খিদিরপুরের মুখে, অর্থাৎ গোবিন্দপুরের শেষ সীমানায় ছিল সুরমান সাহেবের বাগান। সেই সাহেব, যিনি ১৭১৭ সনে কোম্পানির তরফে দূত হয়ে
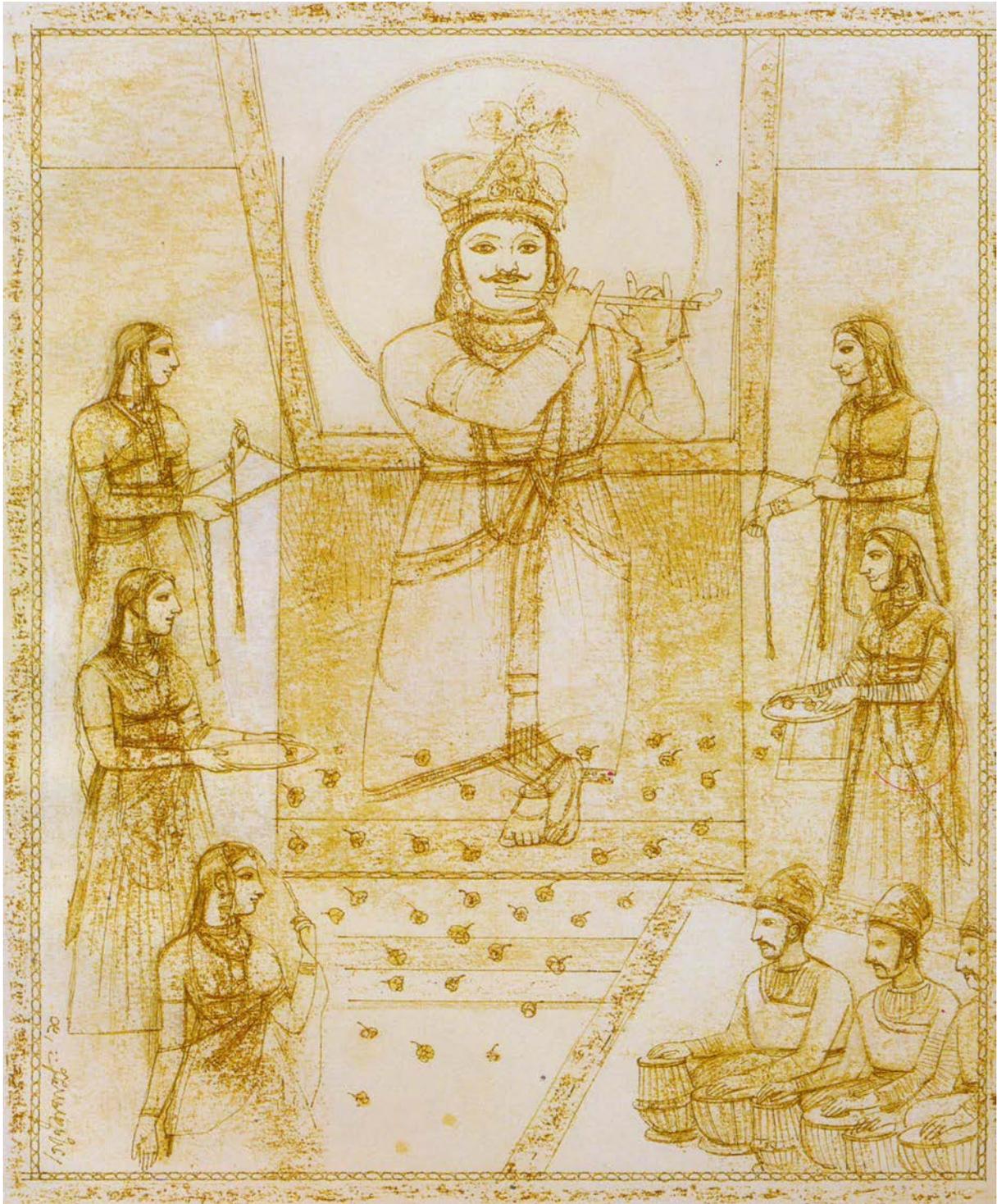
দিল্লি যাত্রা করেছিলেন, এবং ফিরে এসেছিলেন সফল হয়ে। আরও দক্ষিণে ক্যাপ্টেন ওয়াটসনের জাহাজ তৈরির কারখানা। তাঁর নামেই ওয়াটগঞ্জ। ১৭৮১ সনে তিনি এখানে তৈরি করেন প্রথম জাহাজ। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথায় শুধু ওয়াটসনের বাড়ি আর কারখানা নয়, অষ্টাদশ শতকের গার্ডেনরিচেরও সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। প্রসঙ্গত তা শোনাবার মতো। উইলিয়াম হিকি প্রথমবার কলকাতায় আসেন ১৭৭৭সনে। তিনি লিখছেন—"রিচের কোলে পানসি ভিড়ল। তীর থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়ি। কী সুন্দর বাড়ি যে ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য নেই আমার। ভিতের উচ্চতা প্রায় তিরিশ ফুট। তার উপরে বাড়ি, বিশাল তার আয়তন, স্থাপত্যের মুগ্ধকর নিদর্শন।....বহু দূরে—প্রায় নয় মাইল লম্বা ও দু'মাইল চওড়া জলের একটা আস্তরের উপর দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম ও কলকাতা শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। আগাগোড়া নদীর জলের উপর ছোট বড় শত শত জাহাজ ও নৌকা নৌঙর বেঁধে রয়েছে। তারই ভিতর থেকে যেন কলকাতা শহর নদীস্নান করে গাত্রোত্থান করেছে তার বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে।" ওয়াটসনের জাহাজ কারখানার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর উইন্ডমিল বা বায়ুকলের। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীদের আপত্তিতে নাকি সেটি চালানো সম্ভব হয়নি। কারণ, কল থেকে একজন ভদ্র বাসিন্দার অন্তঃপুর দেখা যেত। জাহাজের কারখানা নিয়েও অনেক গোলমাল। জমি দখল করা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের জবরদস্তি করে উঠিয়ে দিয়ে। হিকি লিখছেন—"ক্ষতিপূরণের কোনও লোভ দেখিয়েই তাদের তোলা গেল না। অবশেষে ওয়াটসন সাহেব একদিন একদল সেপাই পাঠিয়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তারপর রাতারাতি সেই জায়গা চষে একেবারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে সমান করে দিলেন যে দেখে সেখানে কোনও লোকের বসবাস ছিল বলে চেনাই যেত না।" ওই সব ঘর বাড়ির কি খোলা-মুচির ছাউনি ছিল ? তাই থেকেই কি মুচিখোলা ? ওয়াটসনের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ান ভূকৈলাশের জয়নারায়ণ ঘোষাল। শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে তাঁর প্রতিরোধেই ওয়াটসনের জাহাজ তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। হিকি তৎকালের গার্ডেনরিচের একটি আনন্দ উৎসবের বিবরণও রেখে গেছেন। উৎসব মানে ফেনউইক সাহেবের মেলা। "এডওয়ার্ড ফেনউইক নামে তখন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান ছিলেন কলকাতায়। মে মাসে প্রায় প্রত্যেক বছরই গার্ডেনরিচে তাঁর বাগানবাড়িতে তিনি একটি চমৎকার মেলার আয়োজন করতেন। কয়েক হাজার নীল রঙিন বাতি দিয়ে বাগান সাজানো হত।" আরও নানা আয়োজন। প্রসঙ্গত তিনি জানাচ্ছেন—'লক্ষ্ণৌ থেকে বিখ্যাত আতসবাজদের আনা হত বাজির উৎসবের জন্য !'

শুধু ওয়াটসনের কল আর ফেনউইক সাহেবের মেলার জন্য নয়, ওই অঞ্চলের

প্রসিদ্ধি আরও নানা কারণে। হেস্টিংস ব্রিজের উত্তরে কুখ্যাত কুলিবাজার। ওয়াজিদ আলি ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকেছিলেন কুলি গেট দিয়ে। কেল্লা গড়ার কারিগরদের আস্তানা ছিল ওই কুলিবাজারের সেই থেকেই কুলি গেট। ওই কুলিবাজারেই ১৭৭৫ সনে নন্দকুমারের ফাঁসি। বাঁয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ভূকৈলাশের রাজবাড়ি। তারপর আরও দূরে ক্রমে বেহালা বড়িশা। ঊনচল্লিশ মাইল দূরে ডায়মন্ডহারবার। অষ্টাদশ শতকে খিদিরপুর থেকে বড়িশা পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি—বীথি। খিদিরপুরের মাইল দুই দক্ষিণে মানিকচাঁদের বাগান। হলওয়েল লিখেছেন—ওই এলাকায় বর্ধমানের রাজাদের বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। বেহালায় একটা বাড়ি ছিল। ওয়াজিদ আলি প্রথম সে বাড়িটিই ভাড়া নিয়েছিলেন ? কটন অবশ্য লিখেছেন, তিনি কিনেছিলেন গার্ডেনরিচে সার লরেন্স পিলের বাড়ি আর বাগান। আগেই বলেছি অষ্টাদশ শতক থেকেই গার্ডেনরিচ রীতিমত শৌখিন এবং অভিজাত এলাকা। ১৭৬০ সনের মার্টিন সাহেবের আঁকা—সেই মার্টিন যিনি পরে লক্ষ্ণৌতে জমিয়ে বসেছিলেন—একটি মানচিত্রে দেখা যায়, সেখানে পনেরোটি বাড়ি রয়েছে। সবই বাগানবাড়ি। তার একটি ছিল সার উইলিয়াম জোন্সের। এই শান্ত শহরতলিতে বসেই তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে সংস্কৃতচর্চা করতেন, সদরউদ্দিনের সঙ্গে ফার্সি। আরও ছাড়িয়ে গেলে আক্রা। এখন সেখানে ইটখোলা। তখন সেখানে নুনের পাহাড়, বারুদের ডিপো আর রেসের মাঠ। আক্রার মাঠেই প্রথম শুরু হয় ঘোড়দৌড়। গার্ডেনরিচে প্রথম বাগানবাড়ি গড়া শুরু হয় নাকি ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ সনের মধ্যে। মেটিয়াবুরুজ কিন্তু আরও পুরানো জায়গা। ও'ম্যালি লিখেছেন মুঘল আমলে সেখানে একটি কেল্লা ছিল। নাম ছিল—আলিগড় কেল্লা। নদীর ওপারে আর এক কেল্লা —থানা। পশ্চিমীরা বলতেন—টানা। নদীর এপার ওপারে লোহার জিঞ্জিরের বন্ধন। উদ্দেশ্য-অবাঞ্ছিত জাহাজকে আটকানো। ক্লাইভ ১৭৫৬ সনে কলকাতা অভিযানের পথে দুটিই দখল করে নিয়েছিলেন। মাটিতে গড়া সেই আলিগড় কেল্লা থেকেই—মাটিয়াবুরুজ। অপভ্রংশে তার—মেটেবুরুজ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়াজিদ আলির পাদস্পর্শে রাতারাতি চেহারা পাল্টে গেল ঐতিহাসিক মেটেবুরুজের। শুধু মেটেবুরুজের কেন, গোটা এলাকার। ইউরোপীয় বাসিন্দারা কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন। সেখানে জাঁকিয়ে বসলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। অতঃপর তিনি মেটেবুরুজের নবাব।

'শরর্' লিখেছেন—'দ্রুত চরিতার্থ হল 'যে ঢুলছে, তাকে শুধু ঠেলে দেওয়ার অপেক্ষা' প্রবচনটি। জমে উঠল আনন্দমণ্ডলী। হিন্দুস্তানের আচ্ছা আচ্ছা গাইয়ে এসে চাকরি নিলেন। মেটিয়াবুরুজে সঙ্গীতকারদের এক অদৃষ্টপূর্ব জমায়েত বসে গেল।.... এখানেও সুন্দরী রমণীদের সমাবেশ এবং প্রেমপ্রণয়লীলায় মেতে যাওয়ার সেই শখ

পুনর্জাগ্রত হল। তবে, মেটিয়াবুরুজের শৌখিন লীলা-বিলাসে কিছু ধর্মীয় সতর্কতা ছিল। বাদশাহ ছিলেন শিয়া। শিয়া ধর্মে অবাধ 'মুত্‌আ' (সাময়িক বিয়ের চুক্তি) বিহিত। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার সাহায্যে বাদশাহ প্রাণভরে শখ মিটিয়ে নিতে লাগলেন। আর একটি নিয়ম ছিল : যার সঙ্গে 'মুত্‌আ' হয়নি তার মুখ দেখা পাপ। অতএব যে যুবতী ভিশতিনি অন্দরমহলে জল নিয়ে আসত, তাকে 'মুতআ' করে খেতাব দিলেন 'নবাব আবরসাঁ বেগম।' হুজুরানির কাছে আসা যাওয়া ছিল যুবতী ঝাড়ুদারনির, তাকেও 'মুত্ আশুদা' বেগমদের শামিল করে নবাব 'মুস্‌ফ্‌ফা বেগম' খেতাবে ভূষিতা করলেন। এইভাবে গানের শখও সীমিত ছিল 'মুত্‌আশুদা' বেগম পর্যন্ত। বাদশাহ বাজারের কোনও বেশ্যার মুজরা দেখেছেন, এটা কদাচিৎ সম্ভব ছিল। 'মুত্ আশুদা' বেগমদের নিয়েই তিনি দল গড়েছিলেন।

মেটিয়াবুরুজে এই রমণীদের নিয়ে তিনি নাকি প্রায় কুড়িটি নাচগানের দল গড়ে তুলেছিলেন : রাধামন্‌জিলওয়ালি, ঝুমুরওয়ালি, লটকনওয়ালি, শারদা মন্‌জিলওয়ালি, নথওয়ালি, ঘুংঘটওয়ালি, রাসওয়ালি, নকলওয়ালি—ইত্যাদি। নাচগান ছাড়াও ওয়াজিদ আলি শাহের শখ ছিল ঘরবাড়ির। নিজে তিনি বাস করতেন 'সুলতান খানা' নামে একটা প্রাসাদে। 'শরর্' লিখেছেন—"সুলতানখানার পাশে জন্ম নিল কুড়িরও বেশি মহল, আরও অনেক বাড়ি এবং সেগুলিরও 'মহলসরা' বা হারেম। গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল শুধু সুলতানখানা, আসাদ-মঞ্জিল, ও মুরস্‌সা মঞ্জিল। বাদশাহী শখ থেকে জন্ম নিল আরও অসংখ্য বাড়ি, যার আশেপাশে সবুজে ভরা আনন্দদায়িনী বাগিচা। আমি যখন দেখেছিলাম, তখন যে-সব বাড়ি বাদশাহের অধিকারে ছিল সেগুলি হল, দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সারি সারি : সুলতানখানা, কস্রউল্-ব্যাযা, গ্যাশ-এ-সুলতানী, শাহানশাহ্ মঞ্জিল, মুরস্‌সা মঞ্জিল, আসাদ মঞ্জিল, শাহ্ মঞ্জিল, নূর মঞ্জিল, তফরীহ বখ্‌শ, বাদামী, আসমানী, তহনিয়ত মঞ্জিল, হুদ্দ-এ-সুলতানী, সদ্দ-এ-সুলতানী, আদালত মঞ্জিল। আরও কয়েকটা বাড়ি ছিল : তাদের নাম আমার মনে নেই।"

বাদশা ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি যাবতীয় ধর্মীয় বিধান পালন করে চলতেন। রমজানে মাসভর রোজা রাখতেন। প্রতিদিন নামাজ করতেন। নিয়মে কোনও ব্যতিক্রম ঘটত না। মহরমের 'মাতমদারি' বা শোকানুষ্ঠানও তিনি পালন করতেন নিষ্ঠা সহকারে। বাদশার নেশা বলতে ওই নাচ গান। কিংবা রমণীবিলাস। আর কোনও নেশা করতেন না তিনি। কখনও মদ, আফিম বা চরস স্পর্শ করতেন না। সুতরাং মেটিয়াবুরুজে প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ইমারতও গড়ে উঠেছিল অনেক। বেশ কিছু মসজিদ ছাড়াও তৈরি হয় সিব্‌তয়নাবাদ ইমামবাড়া এবং খাস ইমামবাড়া—বেতুকবকা। প্রার্থনাস্থান

হোক, আর প্রাসাদ কিংবা বাগবাগিচাই হোক, মেটিয়াবুরুজে সব কিছু সবসময় সাজানো গোছানো। সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। 'শরর্' লিখেছেন—"পৃথিবীতে ইমারত-বিলাসী হাজার হাজার বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু ব্যর্থ জীবন ও নামমাত্র বাদশাহীর স্বল্প অবকাশে, ওয়াজিদ আলি শাহ নিজের শখ ও পছন্দ অনুযায়ী যত বাড়ি তৈরি করে গেছেন, এমন আর কোন বাদশাহ করেননি। শাহজাঁহার পরে, এক্ষেত্রে, কারও নাম যদি করতে হয়, তো তিনি এই অত্যাচার-পীড়িত আউর-নবেশ।" 'শরর্' মেটিয়াবুরুজের গৌরবের দিনের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর নিজের চোখে দেখা বিবরণের অতএব মূল্য অনেক। তিনি লিখেছেন—"লখনউয়ে বাদশাহ 'ক্যয়সর বাগ' আর তার পাশে কয়েকটা ইমারত, পিতার ইমানবাড়ী ও সমাধিভবন, শুধু একটিই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মেটিয়াবুরুজে চমৎকার সব ইমারতের একটা সুন্দর শহরই গড়ে তুলেছিলেন। নদীর পরপারে, মেটিয়াবুরুজের ঠিক মুখোমুখি কলকাতার বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন। কিন্তু মেটিয়াবুরুজের ভূস্বর্গ ও তার বিচিত্র বস্তু সম্ভারের সামনে সে গার্ডেন দাঁড়াতেই পারত না। এই সমস্ত বাড়ি, বাগান, কুঞ্জ ও সবুজ মাঠের চারদিকে উঁচু দেওয়ালের ঘের। মুনিসিপ্যালিটীর সদর রাস্তার ধারে ধারে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত বড়ো বড়ো দোকান। সেখানেই থাকত নিম্নশ্রেণীর চাকর-বাকররা। কাজের সুবিধার জন্যই ওদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা। তবে, ভিতরে যাবার রাস্তা ছিল ফটকের মধ্য দিয়ে ; দোকানের মধ্য দিয়ে যাবার কোনরকম ব্যবস্থা ছিল না। ফটকে পাহারা থাকত। খাস সুলতানখানার ওপর ছিল 'শানদার' (জাঁকজমকপূর্ণ) নহবৎখানা। সেখানে নহবৎ বাজত আর পুরানো পহর ঘড়ীর হিসাবমতো দিনরাত ঘড়ি বাজানো হত।"

মেটিয়াবুরুজে তখন পতপত করে উড়ছে আউধের নবাবদের মৎস্যলাঞ্ছিত পতাকা। সব বাড়ির ললাটেই জোড়া-মাছের টিপ। প্রসঙ্গত এই রাজকীয় প্রতীকটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। মাইকেল এডওয়ার্ড লিখেছেন—এই প্রতীক প্রথম ব্যবহার করেন নবাব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদত আলি। তিনিই প্রথম পুরানো লক্ষ্ণৌর কেল্লাটির নাম রাখেন 'মচ্ছিভবন।' পেম্বেল বলছেন—পুরানো কেল্লার বদলে নতুন কেল্লা গড়েন সফদরজং। তিনিই তার নাম রেখেছিলেন 'মচ্ছিভবন'। এই মৎস্য-প্রতীকের আদি হিসাবে তিনি দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। এক—এই মাছ খাজা খিজিরের প্রতীক। তিনি একজন মান্য ধর্মীয় পুরুষ। তাঁর তত্ত্বাবধানেই ছিল ইসলামী পুরাণের সেই অমরত্বের কূপ। তিনি তার পবিত্র জল পান করেছিলেন। দ্বিতীয়—এই মাছ ইসলাম-পূর্ব কালের পারস্যরাজ খসরু পারভিজের কালের ব্যাপার। মুঘলরাও সম্মানিত লোকেদের খেতাব দিতেন—'মাহি-ও-মারাতিব'। 'শরর্' মনে করেন 'মচ্ছিভবন' আকবরের আমলের ব্যাপার। শেখ আবদুর রহিম নামে বিজনৌরের এক ভাগ্যান্বেষী

তখন এখানে জায়গির লাভ করেছিলেন। 'শেখ আবদুর রহীম শাহী দরবার থেকে 'আলমে-মাহী-মরাতিব' (মৎস্যধ্বজা) দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর কেল্লার একটি বাড়িতে ছাব্বিশটা 'মেহরাব' (খিলান) ছিল ; তার প্রত্যেকটিতে দুটো-দুটো করে মোট বাহান্নটা মাছ খোদাই করে দিয়েছিলেন শিল্পী। ফলে, কেল্লাটির নাম হয়ে যায় 'মচ্ছীভওঅন',—মৎস্যভবন। এই 'ভওঅন' শব্দ কেল্লা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ; কিংবা 'বাওঅন'-এর (বাহান্ন) বিকৃত রূপও হতে পারে।' অন্যত্র তিনি লিখছেন—লক্ষ্ণৌর পথে মেয়েরা 'পিনস' 'সুখপাল' এসব বাহারি বাদশাহি পালকি-ডুলি নিয়ে বের হত। 'পিনসের' ওপর থাকত লাল ছিট কাপড়। তাতে কখনও বা লাল ফিতে। 'কাহাররা পরত লাল বনাতের চোগা ; মাথায় লাল কানাত্ওয়ালা পাগড়ি ; তার হুড়ে রুপোর মাছ সংলগ্ন। মাছ হিন্দুস্তানে শুভ প্রতীক-চিহ্ন বলে গণ্য। বিদায় গ্রহণকালে বা কোনও বড় কাজে যাবার সময়ে আজও মেয়েদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ; 'ওয়হি মছ্‌লি।'

ওয়াজিদ আলি সেই শুভ-প্রতীককেই ছড়িয়ে দিলেন মেটিয়াবুরুজের চার দিকে। 'হুজনে আখতার'-এ তিনি লিখেছেন হাজার পাঁচেক লোক ছিল মেটিয়াবুরুজে তাঁর কাছাকাছি। সেটা মহাবিদ্রোহের আগের কথা। পরে দেখতে দেখতে ভিড় আরও বেড়ে যায়। মেটিয়াবুরুজে লক্ষ্ণৌওয়ালাদের সংখ্যা দাঁড়ায় নাকি চল্লিশ হাজারে। নবাবের সেপাইই ছিল নাকি এক হাজারের কাছাকাছি। তাদের মাস মাহিনা ছিল গড়ে ছয় টাকা। কেউ কেউ আট দশ টাকাও পেত। পাঁচশ'র বেশি ছিল 'মকানদার'—ঘরবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক। তারাও একই বেতন পেত। মুহুরি ছিল জনা আশি। তাদের মাইনে দশ থেকে ত্রিশ টাকা। উচ্চশ্রেণীর সভাসদ এবং কর্মচারী ছিলেন কপমক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ জন। তাঁদের গড় মাইনে আশি টাকা। কেউ কেউ একশ'র বেশিও পেতেন। নবাবের অধীনে 'জানোয়ার বাজ' (পশুরক্ষকই) ছিল নাকি আটশ'র বেশি। তিনশ'র মতো কবুতর-বাজ, তিনশ' মৎস্য-পালক, ত্রিশ চল্লিশজন সাপুড়ে। তারা পেত মাসে ছয় থেকে দশ টাকা। তাদের ওপরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেতন কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা। নবাবের পশুপাখির খাবার জোগাতেই নাকি মাসে প্রায় হাজার টাকা লেগে যেত।

ইমারতের মতো ওই আর এক শখ ওয়াজিদ আলি শাহের। সাহেবরা বারাকপুরে একটা চিড়িয়াখানা গড়েছিলেন। তার আগে খিদিরপুর এলাকায়ও ছোটখাটো একটা চিড়িয়াখানা গড়া হয়। কিন্তু ওয়াজিদ আলি শাহের চিড়িয়াখানার সঙ্গে এসব উদ্যোগের কোনও তুলনাই হয় না। 'শরর্'-এর কলমে সেই আজব চিড়িয়াখানার বিবরণ পড়ে শোনাবার মতো।

"নূর মঞ্জিলের সামনে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা লম্বা-চওড়া পথ। তার

মধ্যে বিচরণ করত শত শত চিতা, হরিণ ইত্যাদি, অরণ্য পশুর দল। ঠিক মাঝখানে, শ্বেত-পাথরে বাঁধানো একটা পুকুর, সর্বদা ভরাভর্তি। তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শুতুরমুর্গ, কিশোরী, ফীলমুর্গ, সারশ, কায়া, বগলা, করকর, চকোর, ময়ূর, হাঁস এবং নানান জাতের পাখি ও কচ্ছপ।.... পুকুরের এক ধারে খাঁচায় থাকত বাঘ। চরণভূমির পাশে, লোহার রেলিংঘেরা সারবন্দী ঘরে কুড়িরও বেশি জাতের এবং খোদা জানেন কোথাকার বাঁদর নিয়ে এনে রাখা হয়েছিল। ....জলাধারের স্থানে স্থানে মাছ পোষা হত। ইশারা করলেই জড়ো হত ; খাবার দিলে নেচে কুঁদে খুব বাহার দেখাত। শাহানশাহ মঞ্জিলের সামনে একটা দীর্ঘ ও গভীর জলাশয় ; তার চারধারে পাড় পিছল করে নেওয়া ; ঠিক মাঝখানে সামনের দিকে ঝোঁকানো একটা কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে সংখ্যাহীন নালী ; দু' এক জায়গায় ওপর থেকে কেটে জলস্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার সাপ। দু'গজ তিন গজ লম্বা বড়ো বড়ো সাপ চব্বিশ ঘণ্টা দৌড়ত, ঘুরত, কিলবিল করত ; পাহাড়ের মাথায় উঠত, আবার নীচে নেমে আসত ; ব্যাঙ ছাড়া হলে দৌড়ে-দৌড়ে ধরত। পাহাড়ের আশেপাশে খালের মতো নালা ; তার মধ্যেও সাপেরা এঁকেবেঁকে ছুটত, ব্যাঙের পিছু নিত ; লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে সেই দৌড় দেখত। পাহাড়ের নীচে দুটো খাঁচা, তাতে থাকত দুটো বড় বড় চিতা। এমনিতে চুপচাপ ; কিন্তু যেই মুর্গী দেওয়া হত ; লাফ দিয়ে ধরে গোটাটাই খেয়ে ফেলত। সাপ পোষার এহেন ব্যবস্থা এর আগে কোথাও হয়নি। এটা খাস ওয়াজিদ আলি শাহর আবিষ্কার। য়োরোপের পর্যটক অবাক হয়ে দেখত, ছবি এঁকে ও বর্ণনা লিখে নিয়ে যেত।"

ওয়াজিদ আলির চিড়িয়াখানার বিবরণ এখানেই শেষ নয়। তারপরও আছে। "এই সব জানোয়ার ছাড়া হাজার হাজার পাখি ছিল। তারা থাকত খাশ সুলতানখানার অন্দরে, পিতল-পিঞ্জরে। লোহার জাল দিয়ে সুরক্ষিত গোটাকুড়ি বড় বড় ঘর ছিল, বলা হত 'গঞ্জ'। তার মধ্যে নানাধরনের অসংখ্য পাখি।... বাদশাহর বাসনা : পশুপাখির যতো জাতি ও শ্রেণী আছে, সব এখানে জমা করবেন এবং এমন এক সম্পূর্ণ ও জীবন্ত চিড়িয়াখানা বানিয়ে যাবেন, দুনিয়ার কোথাও তার জুড়ি নেই। এদের সংগ্রহের জন্য তিনি বেপরোয়া অর্থব্যয়ও করেছেন। কেউ নতুন কোন পাখি বা পশু আনলে যে দাম চাইত পেয়ে যেত। শোনা যায়, বাদশাহ একজোড়া 'রেশমপাখা' পায়রা চব্বিশ হাজার টাকায় এবং এক জোড়া সাদা ময়ূর এগারো হাজার টাকায় কিনেছিলেন। আফ্রিকার জিরাফও ছিল দুটো। কোহানের দুটো বাগদাদী উটও—যা হিন্দুস্থানের আর কোথাও চোখে পড়েনি!" কোনও জানোয়ারই যাতে বাদ না পড়ে, বাদশাহ নাকি সেজন্য দুটো গাধাও রেখেছিলেন তাঁর চিড়িয়াখানায়! তাঁর পায়রাই নাকি ছিল চব্বিশ পঁচিশ

হাজারের মতো !

'শরর্' লিখছেন—"মোদ্দা কথা বাদশাহর অবস্থানের ফলে কলকাতার কাছে দ্বিতীয় লখনউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসল লখনউ ততোদিনে মৃত। সেখানকার বাছাবাছা লোক পাড়ি দিয়েছিল মেটিয়াবুরুজে। বস্তুত সেদিন লখনউ আর লখনউ ছিল না ; মেটিয়াবুরুজই ছিল লখনউ। সেই জীবন, সেই জ্ঞান, সেই কবি, সেই আসর, সেই প্রমোদ উপকরণ ! ওখানকারই বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ, ওখানকারই আমীর ও রইস, ওখানকারই জনতা এখানে। কারও মনেই হত না যে, বাংলায় আছি ! সেই মুর্গীবাজী, বটেরবাজী, আফিমখোর, ফানুস ও ঘুড়ির নেশা ! সেই কথকতা, 'মার্সিয়া' তাজিয়াদারী ! সেই ইমামবাড়া ও কারবালা ! যে জাঁকজমকের সঙ্গে বাদশাহর খাস তাজিয়া উঠত, লখনউয়ের বাদশাহী আমলে কখনও তেমন ওঠেনি। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তো কোন তাজিয়াই উঠতে পারেনি। কলকাতার হাজার হাজার লোক, এমনকি ইংরাজরাও এই 'তাজিয়াদারী' দেখার জন্য চলে আসত।"

সত্যিই, দেখবার মতো জায়গা ওয়াজিদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজ। শিয়া-সুন্নির ভেদাভেদ নেই এখানে। বাদশাহের চোখে সবাই সমান। মিলেমিশে দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌ গড়ে তুলেছে তারা। "মেটিয়াবুরুজের দোকানদার এবং মহাজনও ছিল লখনউয়ের লোক। লখনউয়ের এমন জিনিস ছিল না, যা এখানে পাওয়া যেত না। যেদিকে যান, চোখে পড়বে এক অদ্ভুত শোভা ও জীবনধারা।....শাহী ইমারত, পশুচারণভূমি, সর্বত্রই মেটিয়াবুরুজে প্রবাসী লক্ষ্ণৌওয়ালাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। বাগানে বেড়ান, এর চেয়ে রমণীয়তর স্থান আর কোথাও পাওয়া যাবে না। নদীর তীরে দাঁড়ান, আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন। সামনে দিয়ে চলেছে কলকাতা যাতায়াতকারী জাহাজ ; ফোর্ট উইলিয়ামকে সেলাম জানাবার জন্য এইখান থেকে এরা পতাকা নামাতে আরম্ভ করে। লোকের ধারণা ; সেলাম করছে বাদশাহকে !"

এ-ধরনের বিলাসিতার জন্যই কি রাজ্য হারিয়েছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে লক্ষ্ণৌ তথা আউধের ইতিহাসে। সত্যি বলতে কী, লক্ষ্ণৌর নবাবরা তাঁদের স্বাধীনতা বন্ধক দিয়েছিলেন সেই ১৭৭৭ সনে, রোহিলাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সুজাউদ্দৌলা যেদিন ইংরাজের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র সেদিনই সূত্রপাত। পরবর্তী তিরিশ বছরে আউধে মোতায়েন ইংরাজ ফৌজের ভরণপোষণের জন্য তাঁরা রাজ্যের প্রায় অর্ধেক তুলে দিতে বাধ্য হন ইংরাজের হাতে। দিনে দিনে কোম্পানির ফৌজ যখন বলবান হচ্ছে, তখন ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে নবাবদের নিজেদের বাহিনী। কিন্তু উপায় নেই। প্রতিকূল পরিবেশের চাপে ইংরাজকে একবার 'মিত্র' হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আগেই, ১৭৭২-এ চুনারের দুর্গ ছেড়ে দিতে হয়েছিল ইংরাজের হাতে। ১৭৭৫-এ সামরিক চুক্তির মূল্য হিসাবে ধরে দিতে হল বেনারস এবং গাজিপুর—দুটি জেলা। ১৭৭৮-এ গেল এলাহাবাদ কেল্লা। বোঝা যাচ্ছিল কোম্পানির ক্ষুধা ক্রমেই বাড়ছে। তাদের নগদের দাবিও বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। এই অর্থ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির
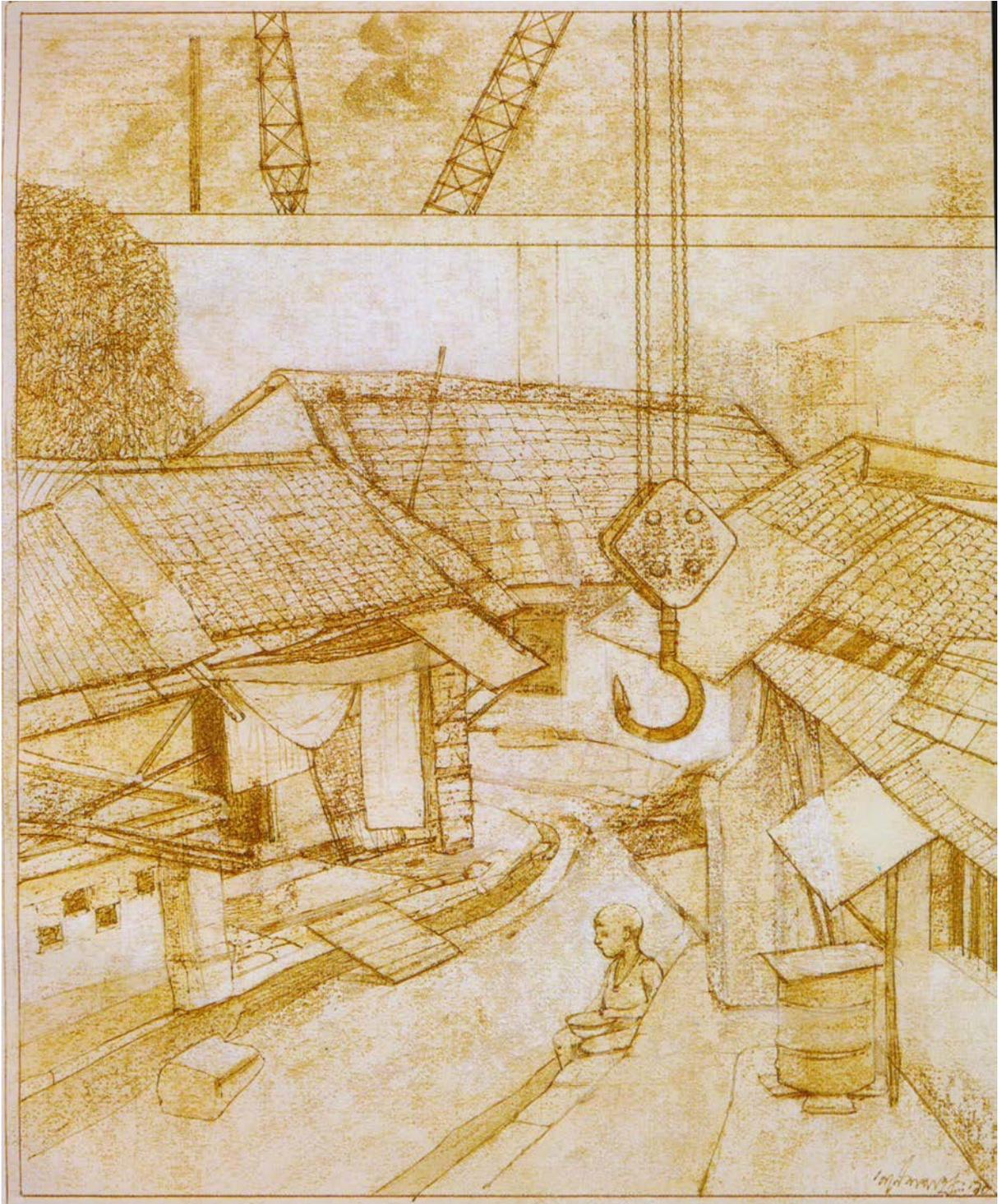
নামে নজরানা। পাছে নবাবরা প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে ব্যর্থ হন সেই ওজর দেখিয়ে রোহিলাখণ্ড এবং এলাহাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে নিল ওরা। যে এলাকা হাতে রইল সেখানে নামেই নবাবদের আধিপত্য। কার্যত দেখা গেল, দিল্লির বাদশার অধীনতার বদলে লক্ষ্ণৌর শাসকরা নতুন প্রভু কোম্পানির 'নবাব'দের অধীন। ১৭৭৩ সনেই নবাবরা 'বৈদেশিক নীতি' নির্ধারণের অধিকার হারান। অর্থাৎ, প্রতিবেশী কোনও রাজ্যের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথাবার্তা বলার অধিকারও তাঁদের নেই। তখন থেকেই ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জাঁকিয়ে বসেছেন রাজধানী লক্ষ্ণৌয়। কথায় কথায় তাঁর খবরদারি। কথায় কথায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ। গোপনে খবর সংগ্রহ। নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য রকমারি ফন্দিফিকির। ওঁরাই রাজা গড়ার আসল কারিগর। ওয়াজিদ আলির সিংহাসন হারাবার কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। মুন্না জানকে নিয়ে তো রীতিমত নাটক। ওঁরাই কাউকে তুলছেন, কাউকে নামাচ্ছেন। নাসিরউদ্দিন হায়দরের আকস্মিক মৃত্যুর পর মুন্না জানের জায়গায় সিংহাসনের একজন দাবিদার ছিলেন একজন নিকট আত্মীয় ইকবালউদ্দৌলা। তিনি তাঁর দাবি আদায় করার জন্য লণ্ডন অবধি ছুটেছিলেন। কিন্তু তার আগেই, নবাব যেদিন মারা যান সে রাত্তিরেই রেসিডেন্ট গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন মুহম্মদ আলি শাহকে। ওঁরাই যেন নবাব-গড়ার আসল কারিগর। তাঁরা স্বীকার করে না নিলে হকদারও সিংহাসন পান না। নাসিরউদ্দিন নাকি ভোজের আসরে বসে পুতুল খেলা দেখতে দেখতে একদিন মজা লুটেছিলেন চুপিচুপি পুতুলের সুতো কেটে দিয়ে। পুতুল সব ছত্রখান। তিনি কি জানতেন না, লক্ষ্ণৌর নবাবদের নিয়ে একই খেলা খেলে চলেছেন রেসিডেন্ট এবং কলকাতার কাউন্সিল? তাঁদের হাতের সুতো কে কাটে!

সাহেবরাই লক্ষ্ণৌর নবাবদের 'কিং' বা বাদশা বানিয়েছিলেন। শুনলে অবাক হতে হয় গাজিউদ্দিন হায়দর যখন বাদশা হন তখন তাঁর অভিষেকের সময় বাজানো হয়েছিল—'গড সেভ দি কিং!' অথচ আউধের বাদশাদের কোনও সত্যিকারের বাদশার সম্মান দেয়নি ইংরাজরা। ১৮১৯ সনে বাদশা হয়ে গাজিউদ্দিন প্রথমে পদবি নিয়েছিলেন 'শাহ-ই-জামান'। পরে—'বাদশা-ই-গাজি।' ইংরাজরা দুটোর কোনওটাই অনুমোদন করেনি। শেষ পর্যন্ত অনেক দরবারের পর বলা হয়েছিল নবাব 'শাহ-ই-জামান' ব্যবহার করতে পারেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হবে 'বাদশা-ই-আউধ।' নবাবের মুদ্রায় অবশ্য দ্বিতীয়টি কখনও মুদ্রিত হয়নি। ১৮২৭ সনে নাসিরউদ্দিন যখন 'শা জাহান' পদবি নেন তখনও আপত্তি তোলে ইংরাজরা। যে সব সরকারি চিঠিতে নবাব এই পদবির সিল ব্যবহার করতেন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সেগুলো গ্রহণ করতেন না। বছর দুই এভাবে আপত্তি তোলার পর নাসিরউদ্দিন তাঁর এই প্রিয়

পদবিটি ভুলে যেতে বাধ্য হন। ইংরাজ লক্ষ্ণৌর নবাবদের মন রাখবার জন্য এক ব্যাপারে অবশ্য কিছুটা খাতির দেখিয়েছিল। নবাবদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল একুশ তোপের অভিবাদন। ব্যস, ওইটুকুই। গাজিউদ্দিন হায়দর নিয়ম করার চেষ্টা করেছিলেন, যেন ইংরাজ রাজকর্মচারীরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তাঁর সামনে মাথায় ছাতা ব্যবহার না করেন, পালকি না চড়েন। তা ছাড়া রেসিডেন্টকে দরবারে গ্রহণ করার নিয়মকানুনও পাল্টাতে চেয়েছিলেন তিনি। পারেননি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পরবর্তীদের অন্য নিগ্রহও ভোগ করতে হয়েছে। ১৮৪৭ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন লক্ষ্ণৌ যান তখন নবাব নাকি বাধ্য হয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর বাহারি জুতোর পরিবর্তে বিলাতি 'শু' পরতে। কেন না, নবাব তাঁর জুতো পরে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করলে মনে হতে পারে গভর্নর জেনারেলের চেয়েও সম্মানে তিনি উঁচুতে!

একদিকে এটা চলবে না, সেটা চলবে না। অন্য দিকে—এটা চাই, সেটা চাই। কোম্পানিকে বিস্তর নগদ অর্থও জুগিয়েছেন অযোধ্যার নবাবরা। একটা হিসাব বলছে—১৮১৪ থেকে ১৮৪২ সনের মধ্যে কোম্পানি লক্ষ্ণৌর নবাবদের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। সুদের হার ছিল শতকরা চার কিংবা পাঁচ টাকা। এসবের বিনিময়ে কোম্পানি নবাবদের দিয়েছে নিশ্চিত নিরাপত্তা। কোম্পানির ফৌজ মোতায়েন রয়েছে, অতএব আউধে বাইরের আক্রমণের ভয় নেই। দেশের ভেতরেও নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব জীবনের প্রতিশ্রুতি এই বিদেশির দল। সুতরাং, এমন পরিবেশে যা সম্ভব তা-ই ঘটেছে। অফুরন্ত অবকাশ আর ঐশ্বর্য জন্ম দিয়েছে একের পর এক বিলাসী নবাবের। ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁদেরই বংশধর। লক্ষণীয়, লক্ষ্ণৌ ভারতের এমন একটি মুসলিম শহর যার চারদিক ঘিরে কোনও প্রাচীর কিংবা পরিখা নেই। এই শহরে সংস্কৃতির রঙিন গোলাপ ফুটবে, তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে তাতে আর বিস্ময় কী! মোটেই বিস্ময়কর নয় ওয়াজিদ আলির জীবন অথবা চরিত্র। তাঁর নিজের লেখা পুঁথিপত্রে যে ওয়াজিদ আলি শাহ, তিনি এক অতিশয় সুসংস্কৃত রুচিমান অভিজাত পুরুষ। উদার, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং সহজ সরল মানুষ। তিনি লক্ষ্ণৌর নবাবদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। তিনি অপদার্থ নন, উন্মাদও নন। পরিবেশ তাঁকে পরিণত করেছে অক্ষম শাসকে। কিন্তু তিনি মরমিয়া কবি, উঁচুদরের শিল্পী। সুতরাং, রাজত্ব হারাবার সময় তিনি যখন লেখেন—'অংরেজ বাহাদুর জুলুম কিয়া,/ মেরা মাল মুল্‌কো সব লুঠ লিয়া,' তখনও তিনি ঠুমরির সুর মনে রেখেই লেখেন!

শোনা যায় ওয়াজিদ আলি ইংরাজের বিষনজরে পড়েছিলেন অন্যরকম আচরণ দেখাতে গিয়েই। সিংহাসনে বসার পর তিনি নাকি উৎসাহের সঙ্গে রাজকার্যে মন দিয়েছিলেন। সাধারণ প্রশাসন এবং সামরিক বিভাগ, দু'দিকেই নজর দিয়েছিলেন

তিনি। সরকারি বিভাগগুলো নতুন করে ঢেলে সেজেছিলেন। মোট ছাব্বিশটি ভাগে ভাগ করা হয় রাজ্য-প্রশাসন। ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য নবাব ইজারা ব্যবস্থার বদলে চালু করতে চাইলেন আমিনি-প্রথা। দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি অনেকের মতেই উন্নতর ব্যবস্থা। সব কাজেই প্রবল উৎসাহ নবাবের। প্রতি সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়ি চড়ে তিনি বের হতেন নগর পরিক্রমায়। গাড়িতে থাকত দুটো রুপোর বাক্স —'মাসগাল-ই-নৌসেরওয়ানি।' সে বাক্সে প্রজারা নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা লিখে জানাত। দরবারে নবারের সামনে খোলা হত বাক্স দুটি। প্রতিটি অভিযোগ তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। ইংরাজরা নাকি প্রজাদের সঙ্গে নবাবের এই সরাসরি যোগাযোগ মোটে পছন্দ করতে পারছিল না। তারা স্থানীয় লোকেদের হাত দিয়ে বেনামী চিঠি ফেলতে আরম্ভ করে বাক্সে। নবাবের বিরুদ্ধে নানা অপমানকর কথাবার্তা তাতে। নানা কাল্পনিক নালিশ। নবাব বিরক্ত হয়ে বাক্স উঠিয়ে দিলেন।

উমরাও জানের কাহিনীতে আছে ওয়াজিদ আলি কেমন করে ফটকের বাইরে ঘুমিয়ে থাকা এক দরিদ্র সৈনিকের ভাগ্য পাল্টে দিয়েছিলেন। তার গায়ে ছেঁড়া পোশাক, কোমরে জং ধরা ভাঙা তলোয়ার। নবাব দরবারি পোশাকে তাকে সাজিয়ে তার তলোয়ারটি নিজে নিয়ে নিজের মাণিমাণিক্য খচিত মূল্যবান তলোয়ারটি তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে। লহমায় ফিরে গিয়েছিল গরিব সৈনিকের ভাগ্য। হয়তো এসব বাদশাহি খেয়াল। সেই হারুন-উল-রসিদের ঢঙে খেলা। কিন্তু বোঝা যায়, তাঁর মন ছিল মরমি। ঝোঁক জনহিতের দিকে।

সৈন্যবাহিনীকে মজবুত করার জন্যও নাকি মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। নতুন কিছু পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হল। 'বাদশাহ অক্ষরলিপির নাম অনুসারে রিসালগুলির নাম রাখলেন—বাঁকা, তিরসা, ঘরঘোর; পলটনদের নাম—আখতরী, নাদরী। নবাব সাহেব স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে ওদের কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষাদান দেখতেন।' কেউ কুচকাওয়াজে দেরি করে এলে তার জরিমানা হত। নবাব নিজেকেও জরিমানা করতেন। তাঁর নিজের গাফিলতির জন্য জরিমানা ধার্য ছিল দু' হাজার টাকা। ওয়াজিদ আলি 'ফৌজী কুচকাওয়াজের জন্য নিজেই ফার্সি শব্দ ও বাক্য তৈরি করেছিলেন; রাস্তব্য—সোজা চলো, পস্ বইয়া—পেছনে ঘুরো, দস্তুর-চপ বার্গির্দ—বাঁদিকে যাও।' ইত্যাদি । কিছুদিন পরে যুবতী মেয়েদের নিয়ে তিনি নাকি এক জেনানা-ফৌজও গড়ে তুলেছিলেন।

দিব্য চলছিল এ সব। কিন্তু বেশি দিন চলল না। লক্ষ্ণৌয় তখন আর কোনও কাজের নবাবের দরকার নেই। রাজ্যের আসল প্রভু যারা তারা মুখে যা-ই বলুক, মনে

মনে খুশি আসলে নবাবরা নবাবগিরির ঝকমারি পোহাতে রাজি না হলেই। ওয়াজিদ আলি অতএব 'পরি'দের নিয়েই মাতলেন৷ কখনও তিনি কানাই সাজেন, বেগম অথবা 'পরি'রা গোপিনী। কিংবা, যোগিয়া উৎসবে মোতি পুড়িয়ে সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে নবাব সাজতেন যোগী, 'পরি'রা যোগিনী! রেসিডেন্ট নিশ্চয় আড়ালে বসে বিশ্বস্তদের বলতেন—সত্যি, এই বাদশার তুলনা হয় না! স্লিম্যান যেভাবে নিষ্ঠা সহকারে নবাবের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী লিখে গেছেন তাতে মনে হয় ইংরাজরা ওয়াজিদ আলি শাহের এই পরিণতি দেখে আসলে খুশিই হয়েছিল!

ওয়াজিদ আলি শাহকে যাঁরা ব্যর্থ, অলস, অকর্মণ্য, বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ বলে চিত্রিত করেন তাঁদের হয়তো আউধের ইতিহাস ঠিক মতো জানা নেই। অযোধ্যায় সেদিন ওয়াজিদ আলি শাহের মতো শাসকই ছিলেন ইতিহাসের স্বাভাবিক ফসল। তাঁর পক্ষে অন্য রকম হওয়া সহজ ছিল না। হয়তো সম্ভবও ছিল না। হলেই বা আর কী হত? এই রাজত্ব হারাবার সঙ্গে কিন্তু ভাল-নবাব মন্দ-নবাবের কোনও প্রশ্ন জড়িয়ে নেই৷ সেসব লোক-দেখানো ওজর মাত্র। স্রেফ বদনাম দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া! ওয়াজিদি আলির এই সব সমালোচকদের জবাবে 'শরর্' যে-প্রশ্নগুলো ছুড়ে দিয়েছিলেন সেগুলো এখনও শোনার মতো। তিনি লিখেছিলেন—

"তাঁর শাসনকাল এই পূর্বীদরবারের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা, সেই সুপ্রাচীন লোকগীতির অন্তিমপদ। যেহেতু তাঁর সময়েই আউধ শাসনের শেষাবসান, তাই তাবৎ বিবেচক ব্যক্তির ধিক্কারের পাত্র হয়েছেন তিনিই; এবং এ কথাও প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন—তিনিই পতনের কারণ। কিন্তু যে সময়ে তাঁর রাজত্বের অবলোপ ঘটে, সে-সময়ে হিন্দুস্থানের সমস্ত দেশীয় শক্তিই ভেঙ্গে পড়েছে; ভালো হোক মন্দ হোক, সব রকমের পুরনো রাজত্ব ও শাসন-ব্যবস্থা বিদায় নিচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। পাঞ্জাবে শিখ ও দক্ষিণে মারাঠাদের পতন হল কেন? তারা তো ছিল বীর, শক্তিশালী, হুঁশিয়ার। দিল্লিতে মুগল শাহানশাহী এবং বাঙ্গলায় নবাব নাজিমের পতন হল কেন? লখনউ অধিপতিদের মতো 'ছেলেমানুষী' তো এঁদের কারোরই ছিল না! উপরিউক্ত চার দরবারের কোনটাতেই তো কোন ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন না।"

'আসল কথা', তিনি লিখছেন—'একদিকে যখন হিন্দুস্থানীদের গাফিলতী ও অজ্ঞতার পরিমাণ আকণ্ঠ-বিস্তৃত, অন্যদিকে তখন ব্রিটিশ রাষ্ট্র আপন যোগ্যতা, দূরদর্শিতা, পরিশ্রম ও প্রযত্ন মাধ্যমে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফল ভোগ করছে। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাশক্তি, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা হিন্দুস্থানীদের অজ্ঞতা ও আত্মবিস্মৃতির ওপর জয়ী হবে না, এ অসম্ভব প্রস্তাব। বিশ্বজুড়ে তখন এক নবীন সংস্কৃতির উত্থান৷ প্রত্যেক জাতিকে ডেকে ডেকে সে-বলছে: আমার

সঙ্গে সে আসবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কালের এই দুন্দুভি-ধ্বনি কেউই শোনেননি ; ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই নিহতের দলে অওধ রাজ্যও সেদিন ছিল। তার পতনের দায়িত্ব বেচারী ওয়াজিদ আলি শাহর ওপর অর্পণ করার অর্থ ইতিাসের প্রতি অন্যায় করা।”
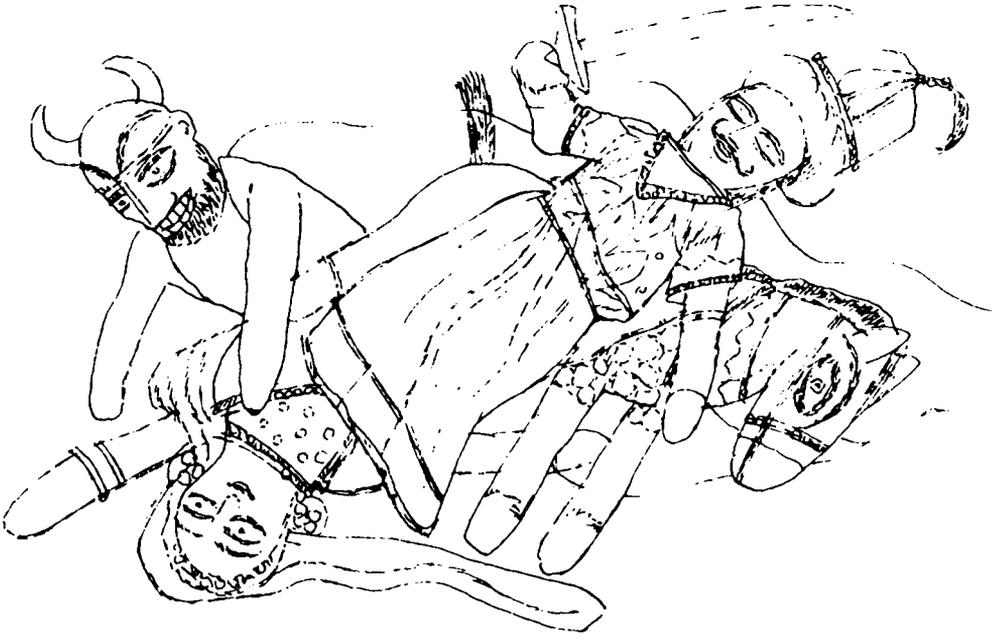
সুতরাং শাসক-ওয়াজিদ আলি শাহকে কাঠগড়া থেকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়। তার চেয়ে বরং মানুষ-ওয়াজিদ আলির কথাই হোক। তাঁর প্রিয় লক্ষ্ণৌকে ভুলতে না পেরে ওয়াজিদ আলি আর এক লক্ষ্ণৌ গড়ে তুলেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে। মনে হতে পারে—এ সব কি নিছক পাগলামি নয়? কিন্তু তা ছাড়া বোধহয় বেঁচে থাকার আর কোনও উপায় ছিল না দুঃখী নবাবের। এ জীবন তাঁর অভ্যাসের জীবন। নাচগান, হারেম, কাব্য চর্চা, মহরমের মিছিল, তাজিয়াদারি—কিছুই যদি না-রইল জীবনে তবে আর কীসের জন্য বেঁচে থাকা? এই জীবন ধারা সম্ভবত তাঁর অহঙ্কারই প্রকাশ। মনে মনে বিদ্রোহী নবাব তাঁর জীবনভঙ্গি দিয়ে তাঁর শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন তারা রাজত্ব কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু জীবনরসিক নবাবের নবাবিয়ানা বন্ধ করতে পারে না। ওয়াজিদ আলির বাহাদুরি চরম দুর্বিপাকেও তিনি তাঁর জীবনছন্দে তালভঙ্গ হতে দেননি, চেষ্টা করেছেন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে।

স্লিম্যান লিখেছিলেন—বাদশার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ ড্রাম-বাদক, নর্তক এবং কবির খ্যাতি অর্জন। রাজ্যের যত 'ডোম' আর ডোমকন্যাদের নিয়ে তাঁর আদিখ্যেতা। তাঁর প্রিয়পাত্র বলতে দু'জন খোজা, দু'জন সারেঙ্গিবাদক বা সেতার-বাদক, জনা দুই কবি, মন্ত্রী ও তাঁর হাতের কিছু ক্রীড়নক। আর একবার লিখেছিলেন—শোনা গেল হিজ ম্যাজেস্টি 'হায়দারি' নামে একটি গদ্য-পুস্তককে কবিতায় রূপান্তরিত করতে ব্যস্ত। দিন দশেক আগে লক্ষ্ণৌর সব কবি সমবেত হয়েছিলেন

প্রাসাদে নবাবের কবিতা শুনতে। আসর চলে সারা রাত। পরদিন একজন কবিকে ডেকে সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেমন শুনলে? তিনি নাকি উত্তর দিয়েছিলেন—নবাব বাদশার পক্ষে বেশ ভাল। ব্যঙ্গের সুর স্পষ্ট।

অথচ সঙ্গীত এবং কাব্যের প্রতি নবাবের আসক্তি এবং অধিকারের কিন্তু কোনও ফাঁকি ছিল না। তর্কের কোনও অবকাশ ছিল না তাঁর শিল্পীসত্তা নিয়ে। লক্ষ্ণৌর নবাবদের মধ্যে আসফউদ্দৌলা এবং গাজিউদ্দিন হায়দরও কবিতা লিখতেন। তবে আসফউদ্দৌলার খ্যাতি প্রধানত সাত খণ্ডের একটি অভিধানের সংকলক হিসাবে। ওয়াজিদ আলির কবি-খ্যাতি একালেও সুপ্রতিষ্ঠিত। 'তিনি যদি আউধের ব্যর্থ নবাব না হতেন তাহলেও বেঁচে থাকতেন তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্য'—লিখেছেন একজন পশ্চিমী গবেষক। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর লেখা অন্তত চল্লিশখানা বইয়ের নাম রয়েছে। তার মধ্যে গজল, মারসি, মসনবি—ইত্যাদি সংগ্রহ ছাড়াও রয়েছে 'সাউত-ই-মুবারিক' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক। মেটিয়াবুরুজে নবাবের ছাপাখানা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কবিতা এবং গানের নানা সংকলন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নবাবের লেখা একটি বিশাল সচিত্র বই রয়েছে। বিষয় : সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা। মেটিয়াবুরুজে ছাপা নবাবের আর একখানা বই 'দুলহন।' নববিবাহিত দম্পতির জন্য নবাবের লেখা গানের সংকলন। বইখানা নিয়ে বাংলায় কিছু আলোচনা করেছিলেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। তিনি লিখেছেন—"চমৎকার নাস্তালিকে গ্রন্থটি লেখা। গ্রন্থটিতে ওয়াজেদ আলীর লেখা বহু গান স্থান পেয়েছে এবং এটি একটি উত্তম সংগ্রহ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বর্তমানে ওয়াজেদ আলী শার নামে প্রচলিত বহু গান আবার এই সংগ্রহে নেই; 'যব ছোড়ি লখনউ নগরী', 'বাবুল মেরা নৈহর ছুটো যায়', বা 'ফুলবালে কন্থ' প্রভৃতি গান এই পুস্তকে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে কিছু ধ্রুপদ, সাধরা, চতুরঙ্গ, তেলেনা, ত্রিবট প্রভৃতি রয়েছে। এ ছাড়া আছে হোরী, চাঁচর, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা, পোস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর গান। ঠুমরীর সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী, দাদরাও আছে সত্তরের কাছাকাছি। টপ্পার সংখ্যাও এগার বার, এবং খেয়াল সতেরো আঠারোটি। বারোটি তসবীরে এই পর্যায়গুলি ভাগ করা আছে। ওয়াজেদ আলী কূট রাগ বা তালের পক্ষপাতী ছিলেন না। অধিকাংশ রচনা পরিচিত রাগে বিন্যস্ত। তালের দিক থেকেও তিনি প্রচলিত তালই অবলম্বন করেছিলেন।" রাজেশ্বর মিত্র মশাই লিখেছেন—"গ্রন্থের মুখবন্ধ ফার্সীতে লেখা। 'সুলতানে আলম' নামে তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর তখল্লুস (ছদ্মনাম) হচ্ছে আখতার। গানে তিনি 'আখতার পিয়া' এই নামটি ব্যবহার করতেন।" এই বইখানা সম্পর্কে আরও অনেক জ্ঞাতব্য পরিবেশন করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। প্রসঙ্গত তা-ও শোনার মতো।

যথা : "গ্রন্থে সামান্য ফার্সী বিবরণী থাকলেও গানগুলি কিন্তু নিছক দেশী ভাষায় রচিত। তিনি উত্তম উর্দু জানতেন, কিন্তু গানে দু একটি উর্দু শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করেননি। গানগুলি থেকে বোঝা যায় লখনউ অঞ্চলের কথ্যভাষা ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 'বোলী'ই তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। মূলত ব্রজভাষাকে অবলম্বন করে তাতে নানারকম প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণ এনে তিনি গানগুলি রচনা করেন। এ ছাড়া পাঞ্জাবে প্রচলিত যে ভাষা টপ্পায় প্রযুক্ত হয় তাও তিনি জানতেন। এ-ধরনের টপ্পাও তাঁর এ-গ্রন্থে আছে। প্রায় সব গানেই তিনি 'মন আলম' বা 'মন মুসান্নিফ' লিখেছেন। এতে মনে হয় এগুলি তাঁরই রচনা।"

বইটি মেটিয়াবুরুজে ছাপা হয় ১২৯০ হিজরিতে। রাজ্যেশ্বর মিত্র নবাবের লেখা গানগুলি পড়ে মন্তব্য করেছেন—'ওয়াজেদ আলী শার গানগুলি পড়লে মনে হয় তিনি ছিলেন অতিশয় ভাবুক এবং মরমী ব্যক্তি। দুলহনে বিধৃত গানগুলির কিছু যদি রচয়িতার নাম উল্লেখ না-করে শোনানো যায় তাহলে মনে হবে তিনি একজন রসিক ও প্রেমিক বৈষ্ণব কবি। বস্তুত একটি গানে তিনি নিজেকে 'আখতার গোঁসাই' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বহু গানে যেন বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন পাওয়া যায়।" কিছু গানও তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর সৌজন্যে দু' একখানা শোনা যেতে পারে।

নবাবের লেখা একটি ধ্রুপদ :

জোগিয়া-চৌতাল

'পুর মন ধন মধকা কলাসে
ভগমগাওত গাওয়েঁ চরাওত
কিষণ কুয়াঁর কানা বনোয়ারী
যো গোপী আওত
বাঁশরী চুরাওত
কানা অধরধারী।'

একটি খেয়াল :

সুরট-জলদ তেতালা

স্থায়ী

'পিয়াবিন গুজর গেয়ি রয়েন মোহেকো
আজ হো নেহি আয়ে পীতম মোরী
মোহে তড়পত বিতি ঘড়ি পল ছিন ছিন

অন্তরা

উনকো বিয়ান তন মনমে রম্ বহো
বিছড়ত নাহিঁ
মোরী হতচিত শোন্
তদ্‌লগি সুন্দর পিয়ারে মোরী
মোহসে তদ্‌হুয়ি মেরি জিয়াক চৈন ।'

"প্রিয় বিনা আমার রাত্রি অতিবাহিত হল। আজও আমার পীতম এসে পৌঁছোলো না। আমার সব সময়, প্রহর, মুহূর্ত, দিন ভাবনায় কেটে যাচ্ছে। তারই চিন্তায় আমার তনুমন আচ্ছন্ন। আমার চেতনা শূন্য হয়ে গেছে। সেই কমনীয় প্রিয়তমকেই আমি সব কিছু সঁপে দিয়েছি । আমার নিজের চেয়ে তারই ওপর আমার জীবনের শান্তি আশ্রিত ।"

তারপর ঠুমরী
জলদ তেতালা

'আরে সেইয়াঁ আয় বিদেশরা
টেং কা সঙ্গে খেলুয়
অম্বুরা কি ডালে কোয়েল কু কি ফুকিয়ে
আয় পাপিহারা ।'

'বন্ধু বিদেশে। কার সঙ্গে আর হবে বসন্তের (চৈত্রের) খেলা। আমগাছের ডালে কোকিল কু কু করে ডাকছে। হায়রে পাপিয়া ।'

এবার একটি দাদরার নমুনা :

'রাত বালম হামসে লড়ে হ্যাঁয়
হামসে লড়ে সারী জগসে ভুলী হ্যায়
না ম্যায় বোলী না ম্যায় চালী
শুনি শেজড়িয়া একেলী পড়ী হ্যায় ।

'রাতে প্রিয়তম আমার সঙ্গে রমণ করেছিল । আমি সমস্ত জগৎ ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কোনও কথা বলিনি, কোনও রকম চঞ্চলতাও করিনি। সম্বিৎ যখন ফিরে পেলাম তখন দেখি শূন্য শয্যায় একলা পড়ে আছি ।'

রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখছেন—"এই গ্রন্থে কয়েকটি গান আছে যার মধ্যে কিছু বিদ্রূপও আছে, নির্মল রসিকতাও আছে।....একটি দাদরা উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এই গানটিতে তখনকার সমাজে মেয়েদের অবস্থা জানা যায়। এই গানের নাম

নবাব দিয়েছেন—'হেকায়েতে জোয়ানীয়ে জন্।'

'আঠুঁই বরষ চাতুরায়ী আয়ি থোড়ী
নওসি বরষ তিরিয়া মান করে বাস কি।
দশরি বরষ তিরিয়া ভয়ি এক রসকি
গেয়ারা হুঁয়ি বরষ যোবনমে জরা কসাকি।
বারহুঁয়ি বরষমে শিঙ্গার সব সাধকি
তীর মারে যায়ে তিরিয়া তেরহুয়িঁ বরষকি।'

'আট বৎসর বয়সে মেয়েদের খুব সামান্য চাতুরীর উদয় হয় । নয় বৎসর বয়স হলে মেয়েরা একটু অভিমান করে মাত্র। দশ বৎসর বয়সে তাদের একটি রসের উদয় হয়। এগার বছরে তাদের কিছু মন্থরতা দেখা দেয়। বার বৎসর হলে তাদের শৃঙ্গারের সব সাধ জাগ্রত হয়। আর তের বৎসরে স্ত্রীলোক তীর মারতে থাকে।'

রাজ্যেশ্বর মিত্র জানিয়েছেন ১৩৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠা জুড়ে বহু প্রশংসাপত্র মুদ্রিত রয়েছে। পঁচিশজন জ্ঞানীগুণী এবং রসিকের একটি নামের তালিকাও তিনি তাঁর প্রবন্ধে যুক্ত করেছেন। সুতরাং, স্লিম্যান যা-ই বলুন না কেন, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ওয়াজিদ আলি সাহেবের প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত।

'তারিখ-ই-পরিখানা'য় নিজের সঙ্গীত চর্চার কিছু বিবরণ দিয়েছেন নবাব। লিখেছেন—তিনি সেতার শিখতে আরম্ভ করেন বিখ্যাত সেতারবাদক কুতুব আলি খাঁর কাছে। তাঁর কাছে শিখে তিনি সেতারে এমন দক্ষ হন যে, যাঁরা হাসছেন তাঁদের তিনি কাঁদাতে পারতেন, কাঁদছেন যিনি তাঁকে হাসাতে। প্যারে খাঁ পর্যন্ত তাঁর সেতারের সুখ্যাতি করতেন। হারেমের সুন্দরীদের জন্য তিনি সঙ্গীতচর্চার বন্দোবস্ত করেছিলেন। একবার প্রাসাদে জলসারও আয়োজন করেছিলেন। বেশ কিছু ওস্তাদ ঠাঁই পেয়েছিলেন তাঁর আশ্রয়ে। তাঁরা নবাবের পরিদের নাচগান শেখাতেন। ওয়াজিদ আলি নিজেও গান শিখতেন নাথু খাঁ নামে একজন ওস্তাদের কাছে। এইভাবেই নিজে তালিম নিয়ে এবং তাঁর 'পরি'দের তামিল দিতে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর স্বপ্নপুরী—'পরিখানা'। সেখানে শুধু নবাব, ওস্তাদ আর 'পরি'দের প্রবেশাধিকার। চারদিক থেকে সুন্দরী আর গুণী মেয়েদের তিনি জড়ো করেছিলেন এই 'পরিখানা'য়। সেই সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ওস্তাদকে। তালিকায় আছেন গোলাম আলি খাঁ ও তাঁর ছেলে গোলাম নবি খাঁ, হায়দর খাঁ, ছোটে খাঁ, খসিট খাঁ, মহম্মদ আসান, ইলাহিয়া খাঁ, ছর্জ্জু খাঁ, হায়দর আলি, নিসার আলি, খাজা বক্স, গোহর আলি প্রভৃতি। ওস্তাদরা কেউ কেউ খেতাব পেলেন তাঁর কাছ থেকে। ছোটে খাঁ পদবি মিলল—'আনিসউদ্দৌলা।' গোলাম রেজা খেতাব পেলেন 'রাজিব উদ্দৌলা', ছর্জ্জু খাঁ—'দেহাজউদ্দৌলা' ইত্যাদি। কিছু কিছু 'পরি' মর্যাদা পেলেন

বেগমের।

ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারের ওস্তাদদের সম্পর্কে 'ক্যকব' নামে একজন ঐতিহাসিককে উদ্ধৃত করেছেন 'শরর্'। 'ক্যকব' লিখেছেন—"ওয়াজিদ আলী শাহর শাসনকালে লখনউয়ে সংগীতাচার্য্যদের একটা বড়ো দল গড়ে উঠেছিল।" তিনিও কুতুবউদ্দৌলা, আনিসউদ্দৌলা, মুসাহেবউদ্দৌলা এবং রাজীবউদ্দৌলার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বলেছেন সকলের কৃতিত্ব সমান ছিল না। তাঁর মতে "গানের আচার্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—প্যারে খাঁ, জাফর খাঁ, হায়দার খাঁ, এবং বাসিত খাঁ। এঁরা সবাই মিঞা তানসেনের খানদানের স্মৃতিবাহক।" লক্ষ্ণৌর গান বাজনার তখনকার গতিপ্রকৃতি তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। কেন না, "সঙ্গীতশাস্ত্র তখন স্বস্থানচ্যুত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবিষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। লখনউয়ে কদরপিয়া 'ঠুমরি' লিখে লিখে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সঙ্গীতের ধারাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন।" তবু তিনি স্বীকার করেছেন—"আসক্তি না-থাকলেও শাহী দরবারে কলাকারদের প্রভূত আদর-সম্মান হত। তার কারণ ওয়াজিদ আলী শাহ গান শিখেছিলেন বাসিত খাঁর কাছে এবং নিজের প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন। প্রখর বুদ্ধির অধিকারী বাদশাহ তাঁর নিজস্ব ঢঙে নতুন নতুন রাগিনী সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের নাম রেখেছিলেন আপন রুচি অনুসারে : 'কন্নড় (শ্যাম), জুহী, যোগী, 'শাহপছন্দ' ইত্যাদি। বস্তুত ওয়াজিদ আলী শাহকে এই শিল্পের আচার্য মনে করা হত।' তবে, ওঁদের মতে ওয়াজিদ আলির কিছু ত্রুটিও ছিল। "সঙ্গীতমর্মজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে যে-দোষ—যা থেকে তিনি কোনদিন মুক্ত হতে পারেননি—নিম্ন শ্রেণীর রুচি, তাই দিয়ে তিনি লখনউ-সঙ্গীতকে তার স্বস্থান থেকে নামিয়ে সাধারণের স্তরে এনে ফেলেছিলেন।" 'শরর্' লিখেছেন—"লখনউয়ের সঙ্গীত এবং ওয়াজিদ আলী শাহ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় 'ক্যকবে'র এই মন্তব্য পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছে, তা হল : একথা স্পষ্ট যে, লখনউয়ে হয়তো উচ্চবিত্ত সঙ্গীতের চর্চা হয়নি। কিন্তু তার সংস্কারসাধনে ও লোকপ্রিয়তা সৃষ্টিতে এই শহর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলে গণ্য হয়েছিল।"

তৎকালেই 'পরি'দের নিয়ে তাঁর বিখ্যাত অনুষ্ঠান 'রাস', হিন্দুদের রাসযাত্রা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওয়াজিদ আলি নিজেই একটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন। সেটা ১৮৪৩ সনের কথা। তাঁর রচনার নাম—'রাধা কৃষ্ণ কা কিস্সা'। 'শরর্' লিখেছেন—"রাস ভালো লেগেছিল ওয়াজিদ আলী শাহর। নিজ রুচিসম্মত একটি কাল্পনিক প্লট তৈরি করে তিনি লিখলেন এক নতুন রাস। দর্শক ছিল জনগণ। তাদের মনে নতুন চেতনা জাগল। এতদিন তারা যে প্রেমকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাতে পরীরা আসত প্রেম ও সৌন্দর্য নিয়ে ; এবার তারা দেখল—ওই প্রেমকে বাস্তব রূপেও দেখা এবং দেখানো

যেতে পারে।" 'তারিখ-ই-পরিখানা' অনুসারে কৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মাহরোক পরি। রাধা হয়েছিলেন সুলতান পরি। আর গোপিনী সেজেছিলেন—আশমান পরি, ইজ্জত পরি, দিল রুবা পরি। 'শরর্' অন্যত্র লিখেছেন—ওয়াজিদ আলির রাস অনুষ্ঠিত হত কাইজারবাগে। 'অভিনয়ে তিনি সাজতেন কানাই, বেগমরা হতেন গোপিনী ; নাচ ও রঙ্গের আসর জমে উঠত।' আর একজন লেখক জানিয়েছেন 'রাধাকৃষ্ণ কা কিস্‌সা' ছাড়াও 'দরিয়া-ই-তাসুক' 'আফসানে-ই-ইশাক' এবং 'বাহার-ই-উলফাত' নিজের তিনটি দীর্ঘ কবিতারও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি। কাইজার বাগের খোলামেলা পরিবেশে এই সব গীতিনাট্য পরিবেশিত হয় ১৮৫১সনে। একটি আসরে নর্তকী ছিল দু'শ, তবলাবাদক—দু'শ। এক এক রাত্রে নাকি পরিবেশিত হত এক একটি অঙ্ক। পুরো নাটক শেষ হতে পুরো মাস শেষ হয়ে যেত। এইখাতে টাকা খরচ হয়েছিল নাকি কয়েক লক্ষ!

কখনও বা 'যোগিয়া মেলা'। যোগীদের উৎসব। 'শরর্' লিখেছেন—"কখনো বা যৌবনেই যোগী সাজতেন ; মোতি পুড়িয়ে হত বিভূতি, শাহানশাহর ফকিরী দেখে নিত সবাই। এই মেলায়, সমাবেশে সবাই যোগ দিতে পারত, সে অনুমতি দেওয়া ছিল। শুধু একটা শর্ত ছিল ; প্রত্যেককে গেরুয়া পরে আসতে হবে। ফলম্ : আশী বছরের বৃদ্ধরাও কষায় বস্ত্র পরিধান করে সেজেগুজে আসত, এবং বাদশাহর যৌবনের আনন্দমদিরা দিয়ে পূর্ণ করে নিত আপন আপন বার্ধক্যের পাত্রগুলি।"

তারপর বিখ্যাত 'ইন্দর সভা'। "দর্শকদের এই প্রবণতা (উৎসাহ) দেখে, শব্দালংকার প্রয়োগে সিদ্ধ কবি মিয়াঁ 'আমানত' লিখলেন 'ইন্দর সভা'—হিন্দু পৌরাণিক কথা ও মুসলমানদের ফারসী রুচির সমন্বয়ের প্রথম নিদর্শন।" 'ইন্দ্রসভা' সম্পর্কে 'শরর্' লিখেছেন—"ইন্দর-সভা প্রদর্শিত হল শহরে। লোকেরা পাগল হয়ে উঠল। অচিরাৎ কুড়িটিরও বেশি 'সভা' গজিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে এত জনপ্রিয় হয়ে গেল, গায়ক এবং নর্তকী- গণিকাদের বাজার কিছুদিনের জন্য মন্দা পড়ে গেল। 'আমানত' ছাড়াও আরও অনেক লোক নতুন নতুন 'সভা' রচনা করতে লাগল।.... এই রুচিই শক্ত করে দিল ড্রামা ও থিয়েটারের বুনিয়াদ। শাহী শাসন যদি আর কিছুদিন টিঁকে থাকত, তাহলে হিন্দুস্থানী নাটক এমন এক নিজস্ব রূপ ধারণ করত, যা একেবারে নতুন, এক বিশেষ রঙে স্নাতক।"

সঙ্গীত এবং নাটকের মতোই নৃত্যেও ওয়াজিদ আলি শাহর বিশেষ অবদান। তাঁর আমলেই লক্ষ্ণৌয় কত্থক নাচের পরিপূর্ণ বিকাশ। আবার 'শরর্'কে উদ্ধৃত করছি। কেন না, তাঁর খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্য নির্ভর। তিনি লিখেছেন—"এখানে (লক্ষ্ণৌয়) বরাবরই হিন্দু কত্থকের কোন-না-কোন ওস্তাদ থাকতেনই।....শুজাউদ্দৌলা এবং

আসফউদ্দৌলার শাসন কালে খুশী মহারাজ ছিলেন বড়ো নৃত্য বিশারদ। নবাব সাদত আলী খাঁ, গাজীউদ্দীন হায়দরের সময় ছিলেন হিলালজী, প্রকাশজী এবং দয়ালুজী। মুহম্মদ আলী শাহ থেকে ওয়াজিদ আলী শাহ পর্যন্ত প্রকাশজীর দুই পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদের নাচের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। দুর্গাপ্রসাদ সম্পর্কে বলা হয়, ইনি ওয়াজিদ আলী শাহর নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের দুই পুত্র : কাল্‌কা ও বান্দাদীন ; এঁরাও খ্যাতিমান ছিলেন। এঁদের প্রসঙ্গে সর্ববাদীসম্মত অভিমত : সারা হিন্দুস্তানে এঁদের চেয়ে বড়ো নাচিয়ে আর কেউ নেই। প্রাচীন ওস্তাদরা বিখ্যাত হয়েছিলেন এক একটা বিশেষ বিষয়ে বা দিকে। কিন্তু এই দুই ভাই, বিশেষ করে বান্দাদীন , নৃত্যকলার সমস্ত বিভাগেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে, সর্বপ্রকারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। বর্তমানের বেশিরভাগ নর্তকই এই দুই ভাইয়ের শিষ্য।"

ওয়াজিদ আলি নিজেও নাচতেন। 'ক্যকব' অবশ্য লিখেছেন : "ওয়াজিদ আলি নাচতেন না। '—লোকে বলত : 'নাচছেন !' আসলে তিনি নাচতেন না, লয়ের মধ্যে লীন হয়ে যেতেন, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে উঠত তারই হিল্লোল। যার পরিচয় নেই, সেই বলবে : বাদশাহ নাচছেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলী শাহ গানের সঙ্গে কখনও কোনকালেই নাচেননি। এই ছিল তাঁর নাচ। ফলত, যতো বড় গায়কই হোন লয়দারীতে বাদশাহর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা কারোরই ছিল না। তাঁর সন্নিধি-ধন্য বিশ্বাসভাজন গায়কদের কাছে আমি শুনেছি—ঘুমন্ত অবস্থাতেও বাদশাহের পায়ের আঙ্গুল নাকি লয়ের তালে চলত !" তবে অন্যরা বলেন বাদশা কখনও কখনও সত্যই নাচতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণের বেশে। নাচ যখন তিনি শিখেছিলেন তখন সে সব খবর নিছক গুজব না-ও হতে পারে। ১৮৬৭ সনে হোলির সময় মেটিয়াবুরুজে নিজের প্রাসাদে এক আসরে ভূতপূর্ব বাদশা নাকি নেচেছিলেন নর্তকীর বেশে। সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন যদুভট্ট, মুরাদ আলি খানের শিষ্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী, সাজ্জাদ মহম্মদ, কেরামতউল্লা খানের শিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্যামলাল চক্রবর্তী। নাচে গানে নিজেই তিনি জমিয়ে তুলেছিলেন আসর। লক্ষ্ণৌর আর এক নবাব নাসিরউদ্দিন হায়দরও নাকি কখনও কখনও রমণীর বেশে থাকতেন। মেয়েদের মতো চলতেন বলতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিকৃতির নানা অভিযোগ শোনা গেছে। বহুবল্লভ ওয়াজিদ আলির অঙ্গে নারীর সাজ, বলাই বাহুল্য, শিল্পের স্বার্থে।

নাচ, গান, কাব্যচর্চার যে ঐতিহ্য তিনি লক্ষ্ণৌয় গড়ে তুলেছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ তা-ই বহন করে নিয়ে এসেছিলেন মেটিয়াবুরুজে, তাঁর নয়া-লক্ষ্ণৌয়। এক সময় তাঁর মেটিয়াবুরুজের আসরে নট নটী, গায়ক গায়িকা এবং প্রয়োগকুশলীর সংখ্যা ছিল নাকি তিন শ'র বেশি। 'শরর্' লিখছেন—"মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহর যে

সমস্ত গায়ক ও বাদক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলের গান আমি নিজে শুনেছি। এহমদ খাঁ, তাজ খাঁ ও গুলাম হুসেন খাঁ সে সময়কার ধুরন্ধর সংগীতকার ছিলেন। দুল্লী খাঁ—যিনি সারা কলকাতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জাদুভরা কণ্ঠ দিয়ে ছোট-বড়ো সবাইকে মোহিত করে দিয়েছিলেন—লখনউয়েরই ছিলেন।" কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় ওয়াজিদ আলি শাহ মেটিয়াবুরুজে জমিয়ে বসবার পরে। বিশিষ্ট গায়ক ছাড়াও শহরের রসিক সম্ভ্রান্ত জনেরা নাকি নিয়মিত নিমন্ত্রণ পেতেন তাঁর আসরে। শহুরে বাঙালির মার্গসঙ্গীত প্রীতির পিছনে অন্যতম প্রেরণা ছিলেন তিনিই। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে 'বাঙ্গালীর গান' থেকে নবাবের লেখা তিনটি গান। বাঙালি শ্রোতার কাছে তাঁর গান যে তখন রীতিমত জনপ্রিয় সেটা বোঝা যায় লক্ষ্ণৌর রাজ্যহারা নবাবকে এভাবে আপন করে নেওয়া থেকেই।

খাম্বাজ-লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

'যব ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌ-নগরী।
কাহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি ॥
আদম গুজারি, সদম গুজারি।
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি ॥'

খাম্বাজ-লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

'(এই সি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া।
হজরত যাঁতিহি লন্ডন কো।
মহলে মহলে মে বেগম রোয়েঁ
গলি গলি রোয়েঁ পাথুরিয়া ॥'

খাম্বাজ-লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

'শাহজাদে আলাম তেরে লিয়ে,
মায়ে তো জঙ্গলা সেহরো বিয়াবানা ফিরে।
তানাখাকা মালি, পাহেলি কাকলি,
করা যোগেনাকা সমান ফিরি।
পূরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ,
দিল্লি গহরা মূলতানা ফিরি।'

লক্ষণীয়, বাঙালি নবাবের লেখা সেই গানগুলোই সযত্নে চয়ন করে সাজিয়ে রেখেছিলেন যেগুলি রোদনভরা, যে গানে সিংহাসনহারা নবাব যেন এক দুঃখী ভবঘুরে।
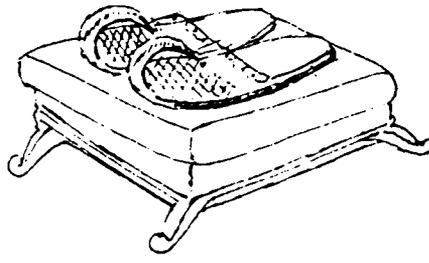
হয়তো তাঁর নিজের প্রজারাও তা-ই ভাবত। ভাবত বাদশার আর অপরাধ কী, অপরাধী আসলে ইংরাজ। বিনা দোশে তারা কেড়ে নিয়েছে বাদশার রাজত্ব। শাসক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, ভাল অথবা মন্দ, সে সব যুক্তি তাদের কাছে অবান্তর। তারা জানে ইংরাজ পরদেশি। তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা। পোশাক পরিচ্ছদ, চালচলন—সবই তাদের অন্য রকম। অন্যদিকে বাদশা তাদের আপনজন। তিনি অপদার্থ হতে পারেন, অত্যাচারী হতে পারেন, কিন্তু তাদের আপনজন। সেকালের সামন্ত-প্রভুদের সঙ্গে দীনদরিদ্র প্রজার এই অবিশ্বাস্য আত্মীয়তা ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা আলোচনাও করেছেন বিস্তর। এখনও করছেন। সে-সব প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নেই। আমাদের বলার কথা একটাই—ওয়াজিদ আলি শাসক হিসাবে কতখানি প্রজা-প্রিয় ছিলেন তা নিয়ে হয়তো তর্ক চলতে পারে, কিন্তু রাজ্য হারিয়ে তিনি যে রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। অনেক চেষ্টা হয়েছে স্বেচ্ছানির্বাসিত নবাবের চরিত্রহননের। মাইকেল এডওয়ার্ডস ১৮৬৪ সনের কলকাতার কোনও একটি ইংরাজি কাগজ থেকে একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গাত্মক চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। বিদ্রূপের উপলক্ষ—মেটিয়াবুরুজের নবাব। সরকারি পেনশনের টাকায় তিনি কেমনভাবে অলস জীবন যাপন করছেন তার বর্ণনা দিয়ে পত্রলেখক নবাবের শৌখিনতারও কিছু নমুনা দিয়েছেন। ওয়াজিদ আলি নাকি এক জোড়া ময়ূরের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতেও রাজি! তিনি লিখেছেন—ভূতপূর্ব বাদশা এই তো সেদিন এক জোড়া শকুন কিনলেন পঞ্চাশ হাজার টাকায়। নগদ দেওয়া হল ৩৫ হাজার।—বাকি? নবাবের কোষাধ্যক্ষ সবিনয়ে জানালেন—হুজুর তহবিলে আর নগদ টাকা নেই। —তাতে কী হয়েছে? নবাব হুকুম দিলেন একটা সোনার পালঙ্ক বেচে দাও। নবাব সাদত আলির আমলের দুটি সোনার খাট ছিল মেটিয়াবুরুজের প্রাসাদে। তার মধ্যে একটি ভেঙে গালিয়ে ফেলা হয় শকুনের দাম মেটাবার জন্য।—সরকারি অর্থের কী সুন্দর সদ্ব্যবহার। মন্তব্য করেছেন পত্রলেখক। অনুমান করি, মেটিয়াবুরুজের কোনও মানুষ কানে তোলেননি এইসব অপপ্রচার। শত নিন্দা সত্ত্বেও এই দুঃখী নবাব

তাদের প্রিয়। এখানে যাঁরা ভিড় করেছিলেন হয়তো তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন পরগাছা, নবাব ছিলেন তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। ওয়াজিদ আলিকে অনুসরণ করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও গতি ছিল না। কিন্তু মেটিয়াবুরুজের ভিড়ে শুধু আমির নয়, গরিবরাও ছিল। সবাইকে নিয়েই সেদিনের মেটিয়াবুরুজ। হাজার হাজার জীবিকাসন্ধানী সাধারণ মানুষ ছাড়াও লেখক, শিল্পী, গায়ক, নর্তকী, সবাই ছিলেন সেই ভিড়ে। সবাইকে নিয়েই জমে উঠেছিল ওয়াজিদ আলির মেটিয়াবুরুজ।

কী না ছিল সেখানে? 'শরর্' নবাবি জৌলুসের দিনের মেটিয়াবুরুজের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর বিবরণ থেকে কিছু টুকরো খবর উদ্ধৃত করছি। মহলের পর মহল যেমন, তেমনই দফতরের পর দফতর। অনেকগুলি ছোট ছোট 'মহকমা' (বিভাগ): "'বাওঅর্চিখানা', 'আবদারখানা', 'ভিস্তিখানা', 'খসখানা' এবং খোদা জানেন, আরও কী কী বিভাগ!" তিনি নবাবের কিতাবখানা, ছাপাখানা, এবং চিত্রকরদের দফতরও যোগ করতে পারতেন। লক্ষ্ণৌর খানাপিনার খ্যাতি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। মেটিয়াবুরুজেও নবাব নাকি অম্লান রেখেছিলেন তাঁর রসুইখানার খ্যাতি। শুধু তিনি নন, মেটিয়াবুরুজে লক্ষ্ণৌর খানা খুশবু ছড়িয়ে পড়েছিল নাকি নবাবের অনুগত একজন রইস মুনশি উসসুলতান বাহাদুরের দৌলতে। নবাব নিজেও নাকি বিনয় করে বলতেন—আমি কী আর এমন ভাল খাই, ভাল খান তো মুনশি উস্‌সুলতান। প্রাসাদে নহবত, রোশনচৌকি, লক্ষ্ণৌর মতো প্রহরে ঘড়ি—এসব তো ছিলই, অন্যান্য নবাবি বিলাসিতা চলছিল লক্ষ্ণৌরই মতো। যথা: ভেড়ার লড়াই, মুর্গিবাজি, 'কনক্যওয়ার' বা পতঙ্গবাজি। ভেড়ার লড়াই তত্ত্বাবধান করতেন সেই মুনশি-উসসলতান, কসাইরা সাহায্য করত তাঁকে। 'শরর্' লিখেছেন—"এখনও আমার মনে আছে—একবার, বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে বাদশাহর চিড়িয়াখানা দেখবার জন্য কলকাতার কয়েকশত ইংরেজ এসেছিল। বাদশাহ-স্বলামত স্ব-মর্যাদা বিরোধী 'বুচা'য় (পালকি বা ডুলি) সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন, এবং সমাগত অতিথিদের আনন্দদানের জন্য ভেড়ার লড়াইয়ের আদেশ দিলেন। ভেড়া এল। শুরু হল সশব্দ টক্কর।" মেটিয়াবুরুজে মুর্গিবাজিও ছিল। "মেটিয়াবুরুজে নবাব আলী খাঁর বাড়িতে মোরগ প্রতিপালিত হত। কলকাতা থেকে কয়েকজন ইংরেজও নিজেদের মোরগ নিয়ে আসত লড়বার জন্য। বাদশাহ, তাছাড়া অনেক রইসেরও মোরগবাজীর শখ ছিল।" আর কবুতর-লড়াই? 'শরর্' লিখেছেন—"ওয়াজিদ আলি শাহ মেটিয়াবুরুজে অনেক পায়রা জড়ো করেছিলেন। শোনা যায় এক জোড়া রেশম-পাখা-পায়রা তিনি কিনেছিলেন পঁচিশ হাজার টাকায় এবং এক জাতের সবুজ পায়রার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। যখন তাঁর দেহান্ত হল, তখন তাঁর ছিল ত্রিশ হাজারেরও বেশি পায়রা, সে জন্য একশোরও বেশি

কবুতরবাজ চাকর, এবং সবার ওপরে দারোগা গুলাম আব্বাস—কবুতরবাজীর কলাবিদ্যায় যাঁর জবাব ছিল না।' পতঙ্গবাজিতে নাকি মেটিয়াবুরুজের তখন প্রায়-লক্ষ্ণৌর মতো খ্যাতি। ইলাহিবখ্শ্ নামে একজন খুবই নাম করেছিলেন মেটিয়াবুরুজে। মেটিয়াবুরুজ লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতিরই একটি উপনিবেশ যেন।

শুধু এই সব বিলাসিতা নয়, গানবাজনার মতো মেটিয়াবুরুজে অব্যাহত ছিল অন্যান্য সুকুমার শিল্পের চর্চাও। লক্ষ্ণৌ-কলমের চিত্রকলার ধারা ওয়াজিদ আলির সূত্রেই পৌঁছেছিল মেটিয়াবুরুজে।

চিত্রশিল্পে আউধের ঐতিহ্য অনেক দিনের। তার সূচনা সেই সফদরজঙের আমলে। অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। বিকাশ সুজাউদ্দৌলার শাসনকালে। মুঘল রাজধানী দিল্লিতে তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। দরবারি শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়ছেন চার দিকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছিলেন সুজাউদ্দৌলার রাজধানী ফৈজাবাদে। একই সময়ে কলকাতায় পদার্পণ করছেন কিছু কিছু বিদেশি চিত্রকর। এই অভিযাত্রী শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে আউধযাত্রী। সে দলে প্রথম শিল্পী টিলি কেটল। তারপর ক্রমে জোফানি, দুই ড্যানিয়েল, হামফ্রে প্রমুখ। প্রথম দিকে আউধের চিত্রকলা ছিল মুঘল চিত্রকলারই একটি শাখা বিশেষ। যাকে বলে প্রভিন্সিয়াল মুঘল। মুঘল অবক্ষয় যুগের ছায়াপাত সে-পটে। ফৈজাবাদ এবং পরে লক্ষ্ণৌয় বিদেশি শিল্পীদের সংসর্গে আসার পর ছবিতে আবার পশ্চিমের ছায়া। এ ঘরানার অধুনা নাম—কোম্পানি পেইন্টিং। এ ছবি ঈষৎ অন্য রকম বটে, কিন্তু পুরোপুরি আউধের নিজস্ব শিল্পকলা নয়। শিল্প ঐতিহাসিক আর সি শর্মার মতে আউধ তার নিজস্ব চিত্রভাষা এবং ভাষ্য খুঁজে পায় ওয়াজিদ আলি শাহর আমলেই। (দ্রষ্টব্য : আউধ স্টাইল অব পেইন্টিং অ্যান্ড বেঙ্গল, আর সি শর্মা।)

পশ্চিমী বা সাহেবি কেতার প্রতি ওয়াজিদ আলি শাহর কোনও দুর্বলতা ছিল না। বস্তুত ইংরেজদের তিনি পছন্দ করতেন না। বাদশা এবং তাঁর সভাসদেরা কেউ পশ্চিমী পোশাক পরতেন না। পশ্চিমী আদব কায়দাতেও বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না তাঁদের। তাঁর আমলে লক্ষ্ণৌর সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তাই হিন্দু এবং মুসলমানের পুরাণ, উপকথা, লোকগাথার বিশেষ প্রভাব। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং রাস তখন লক্ষ্ণৌয় জনপ্রিয় উৎসব। ওয়াজিদ আলির কালে আউধের চিত্রশিল্পেও সেই ভাবধারারই প্রতিফলন। শিল্পীর পটের কেন্দ্রে তখন বাদশা, তাঁর খেয়ালখুশি, তাঁর আমোদপ্রমোদ। কিংবা নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসব। শর্মার মতে এসব চিত্রেই পূর্ণবিকশিত লক্ষ্ণৌর চিত্রধারা। সে ধারার প্রাণ—জাতীয়তা।

ওয়াজিদ আলির পিছু পিছু লক্ষ্ণৌর সেই শিল্পধারা পৌঁছেছিল কলকাতায়ও।

গদিচ্যুত বাদশাকে ভুলতে পারেননি অনুগত শিল্পীরা। আরও অনেক শিল্পী এবং বাহাদুর কারিগরদের মতো কোনও কোনও চিত্রশিল্পীও আস্তানা গেড়েছিল নতুন লক্ষ্ণৌ মেটিয়াবুরুজে। কিংবা কলকাতায়। কেউ কেউ হয়তো আসাযাওয়া করতেন। কলকাতা প্রবাসেও তাঁরা পুষ্ট করেছেন লক্ষ্ণৌর নিজস্ব চিত্র-ঐতিহ্য। লক্ষ্ণৌর সরকারি জাদুঘরে সে আমলের বেশ কিছু ছবি রয়েছে। গবেষক আর সি শর্মা বেশ কয়েকজন শিল্পীর নামও উদ্ধার করেছেন। যথা : গজরাজ সিং, আসফ আলি খান, গুলাম মুস্তাফা, মুহম্মদ মাসুদ, মুহম্মদ ওয়াজির, হাসান আলি, এবং জাহান আলি খান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় পাড়ি জমিয়েছিলেন কলকাতায়। কারও কারও যে আসা-যাওয়া ছিল মেটিয়াবুরুজে তার অন্য প্রমাণও রয়েছে।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ওয়াজিদ আলির একটি শেষ বয়সের প্রতিকৃতি রয়েছে। শিল্পী—মুহম্মদ জান। তিনি তখন মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা। বাদশাহর দরবারি চিত্রকর। কলকাতায় আঁকা ওয়াজিদ আলি শাহের আরও একটি প্রতিকৃতি সংগ্রহ করেছেন শহরের একজন কলারসিক। এটিও কলকাতায় আঁকা। মেটিয়াবুরুজে অসংখ্য পুঁথি লিখিত এবং চিত্রিত হয়েছে। তার যৎসামান্য এখনও যা অবশিষ্ট আছে সেখানকার ইমামবাড়ায় তা দেখবার মতো। দেখবার মতো এমনকি মেটিয়াবুরুজে সরকারি ছাপাখানায় মুদ্রিত বইগুলো। ভারতীয় পুঁথি-শিল্পের যে মনমাতানো ধারা, তা অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্ণৌর ফার্সি এবং উর্দু বইয়ের মুদ্রাকররা। ওয়াজিদ আলির ছাপাখানাতেও সেই ঐতিহ্য। ভাবতে অবাক লাগে, শেষ পরিণতি কী হবে, সে সব কথা না ভেবেই নেশাগ্রস্তের মতো ওঁরা সাজিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌ। শুধু অর্থের লোভে নয়, হারানো লক্ষ্ণৌকে আবার তাঁরা খণ্ডিত রূপে হলেও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বোধহয় নবাবের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ আর ভালবাসার জোরেই।

সত্যি বলতে কী, আউধের এগারোজন নবাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধহয় ওয়াজিদ আলি শাহ। তাঁর বিলাসিতা, খেয়ালিপনা, কবি-স্বভাব, নাচগান নিয়ে মাতামাতি—যে সব কারণে তিনি কোনও কোনও মহলে নিন্দিত, সেই সব চরিত্র লক্ষণই তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। নিষ্ঠাবান শিয়া ওয়াজিদ আলি ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদার। লক্ষ্ণৌ-সংস্কৃতির বিকাশের মূলেও ছিল এই সহনশীলতা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের লেনদেন চলেছে সর্ব ব্যাপারে। হিন্দুরা যেমন মুসলিম উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়েছেন, উর্দু সাহিত্যের চর্চা করেছেন, মুসলমানরাও তেমনই রাস-উৎসব থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন, হিন্দু পুরাণ অবলম্বন করে নাটক লিখেছেন। এমনকি নবাবদের হারেমে হিন্দু মেয়েদের ষষ্ঠী-ব্রতের অনুকরণে

একটি মেয়েলি অনুষ্ঠানেরও চল ছিল। ওয়াজিদ আলির সময়ে লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলমান ছিলেন শতকরা চল্লিশজন, বাদবাকি হিন্দু। তবু, সর্বাঙ্গে মুসলিম ছাপ জ্বল জ্বল করলেও লক্ষ্ণৌ-সংস্কৃতি মুসলিমদের মতো হিন্দুদেরও গর্ব। গাজিউদ্দিন হায়দরের হারেমের মতো ওয়াজিদ আলি শাহের অন্তঃপুরে কোনও উল্লেখযোগ্য হিন্দু বেগম ছিলেন না। কিন্তু পূর্বের ধারা বজায় ছিল দরবারে। মুসলমানের মতো হিন্দু জায়গিরদাররাও খাতির পেতেন, হিন্দু কলাকারও সম্মানের আসন পেতেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত একটি হিন্দু পরিবার ছিল লক্ষ্ণৌর নবাবদের দেওয়ান বা রাজস্ববিভাগের কর্তা। আউধে তৎকালে যদিই বা কোনও ধর্মীয় বিরোধ বাধত সে শিয়া আর সুন্নির মধ্যে, কদাচ দেখা গেছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হাঙ্গামা। ১৮৫৫ সনে কিছু মোল্লার নেতৃত্বে অযোধ্যার হনুমান মন্দিরের কাছে একটি মসজিদ গড়ার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল, সেখানে মাটির তলায় একটি মসজিদ চাপা পড়ে আছে। তাই নিয়ে উত্তেজনা। দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। ওয়াজিদ আলি কঠোর ব্যবস্থা করেন। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নবাবি ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সেখানে। মন্দিরের জায়গায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা তাঁর অনুমোদন পায়নি।

ভারতের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্মরণীয় সে ঘটনা। হাল আমলের বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে যে তপ্ত বিতর্ক এবং উন্মত্ত আন্দোলন তার প্রেক্ষিতে সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক এবং উদ্বিগ্ন সমাজবিজ্ঞানীরা বার বার স্মরণ করছেন ১৮৫৫'র সেই আগ্নেয় দিনগুলো। কেননা, রণভূমি—সেই আউধ, সেই অযোধ্যা নগরী ; উপলক্ষ—সেই মন্দির অথবা মসজিদ। একশ' পঁয়ত্রিশ বর্ষ পরে পরিবর্তিত পটভূমিতে আবার ফিরে এসেছে সেই পুরানো প্রশ্ন। নানা কারণে পরিস্থিতি আজ আরও উদ্বেগজনক। সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে পরিণতি কী হতে পারে তা-ই ভেবে চিন্তাশীলেরা আজ উদ্বিগ্ন। তাঁরা বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছেন ওয়াজিদ আলি শাহর দিকে। মিশ্র সংস্কৃতির এই দেশে হিন্দুপ্রধান একটি রাজ্যে মুসলমানদের আবেগমথিত এক ধর্মীয় আন্দোলন উপলক্ষে একজন মুসলমান শাসক যদি সাহসিকতার সঙ্গে আপন ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন তবে একালের শাসকরাই বা ব্যর্থ হবেন কেন ? মনে রাখতে হবে হিন্দু এবং মুসলমান তাঁর দুই চোখের 'দুই মণি' কে রক্ষা করাই ওয়াজিদ আলির একমাত্র কাজ ছিল না, সেই সঙ্গে তাঁকে সামাল দিতে হয়েছে রেসিডেন্ট তথা বিদেশি সরকারের মেজাজমর্জিকেও। হনুমানগড় উপলক্ষে ওয়াজিদ আলি এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে কীভাবে আপন কর্তব্য পালন করেছেন তা সত্য সত্যই দেখবার মতো। দেখবার, এবং শেখবার মতো। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : 'এ ক্ল্যাশ অব

কালচারস : আউধ, দি ব্রিটিশ অ্যান্ড দি মুঘলস, মাইকেল এইচ ফিলার ।)

কেন, তা বুঝতে হলে একবার তাকানো দরকার ১৮৫৫'র অযোধ্যানগরীর হনুমানগড়ের দিকে। হনুমানগড় অযোধ্যার উপান্তে একটি হিন্দু মন্দির। কেউ বলেন রামের সেনাপতি হনুমানের সৈন্যদের আস্তানা ছিল বলেই জায়গার নাম হনুমানগড়। কেউ বলেন— হনুমানগড় আসলে হনুমানের মন্দির। ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র স্বল্পায়ু রাজত্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ বোধহয় পেশ করেন জি ডি ভাটনগর তাঁর 'আউধ আন্ডার ওয়াজিদ আলি শাহ' বইটিতে। সমকালীন দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে রচিত এই বইয়ে শুধু ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র শাসন ব্যবস্থার সব দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি, হনুমানগড়-উপাখ্যানের পূর্ণ বিবরণও এ বইয়েই লভ্য। সংক্ষেপে সে কাহিনী শোনার মতো।

অযোধ্যা শহরের অদূরে হনুমানগড়ে একসময় একটি মসজিদ ছিল। শোনা যায়, একটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে তার জায়গায় এই মসজিদ গড়েছিলেন বাদশাহ আউরংজেব। হিন্দুরা মন্দিরের দাবি কোনও দিনই ত্যাগ করেননি। তাঁরা কাছাকাছি একটি জায়গায় নিজেদের পূজা-আর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওয়াজিদ আলির একজন পূর্বপুরুষ লক্ষ্ণৌর নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্সারের পথে সেখানে ছাউনি ফেলেছিলেন। তিনি হিন্দুদের একটি মন্দির গড়ে দেন। হিন্দু 'বৈরাগিরা' সেখানে আস্তানা গাড়েন। স্থানীয় একজন সামন্ত রাজা দর্শন সিং পরে মন্দির ঘিরে একটি মজবুত দেওয়াল তৈরি করিয়ে দেন। বৈরাগিদের থাকবার জন্য তিনি মন্দির-চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকটি ঘরও করে দেন। ওদিকে আউরংজেবের সেই মসজিদ কালে কালে জীর্ণ হয়ে অবশেষে লুপ্ত। ১৮৫৫ সনের জুনে হঠাৎ মুসলমানদের একাংশ দাবি জানালেন তাঁরা হনুমানগড়ে প্রার্থনা সভা করবেন। তাই নিয়ে রীতিমত আন্দোলন। আন্দোলনের নেতা শাহ গুলাম হুসেন এবং তাঁর চেলা মৌলবি মুহম্মদ শাহ। ওঁদের নেতৃত্বে মুসলমানরা নিজেদের সংগঠিত করতে লাগলেন। সুলতানপুরের নাজিম আগা আলি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁদের তখনকার মতো নিরস্ত করেন। বলেন— কোথায় মসজিদ, আগে তার ফয়সালা হোক। আর, তার দায়িত্ব বাদশার ওপর ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত।

লক্ষ্ণৌয় নবাবের দরবারে খবর পৌঁছল। খবর শোনা মাত্র ওয়াজিদ আলি এক তদন্ত কমিশন বসালেন। হিন্দু মুসলমান নিয়ে মিশ্র কমিশন। তবু উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। মুসলিম আন্দোলনকারীরা স্থির করলেন জুলাইয়ের ২৮ তারিখে তাঁরা হনুমানগড়ে নামাজ পড়বেন।

সংকট ঘনিয়ে এল। ফৈজাবাদ থেকে নবাবি সৈন্য নিয়ে ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন ওর। তিনিও তখনকার মতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে আন্দোলনকারীদের সামাল দিলেন।

হনুমানগড়ে কিছু সৈন্য মোতায়েন করে আবার তিনি ফিরে গেলেন ফৈজাবাদ। নির্দিষ্ট দিনে, অর্থাৎ জুলাইয়ের ২৮ তারিখে ক্যাপ্টেন হিয়ার্সেকে সঙ্গে নিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন হনুমানগড়ে। আন্দোলনকারীদের ওঁরা বললেন—ধৈর্য ধরুন। তার চেয়ে চলুন লক্ষ্ণৌ। স্বয়ং বাদশার কাছে নিজেদের বক্তব্য নিবেদন করুন। বৈরাগিরা এই প্রস্তাবে সম্মত। কিন্তু আন্দোলনকারী মুসলমানেরা নয়। সুতরাং, যা ঘটবার তা-ই ঘটল। সংঘর্ষ। রক্তপাত। বাদশাহি বাহিনীতে সিপাই ছিল মাত্র দেড়শ। তাদের সাধ্য কী, এ লড়াই প্রতিহত করে। বৈরাগি বনাম মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৭০ জনের। শাহ গুলাম হুসেন কোনও মতে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

বৈরাগিদের হাতে এই লাঞ্ছনার সংবাদে গোটা অযোধ্যার মুসলমানেরা উত্তেজিত। উত্তেজনা এমনকি খাস লক্ষ্ণৌ শহরেও। হনুমানগড় দখলের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল গোটা রাজ্যে। ওয়াজিদ আলি শাহ গুলাম হুসেন ও তাঁর অনুচর মৌলবি মুহম্মদ শা'র ওপর রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন—ওরা দুর্বৃত্ত। আমি আগেই ওই দুর্বৃত্তদের ধরে এনে প্রাপ্য শাস্তি মিটিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমার মুসলিম প্রজারা আহত বোধ করত। ভাবত, নিশ্চয় কেউ আমাকে কুপরামর্শ দিয়ে প্রভাবিত করছে। তা ছাড়া, তারা এটাও বলতে পারত, তদন্ত না করে এভাবে কাউকে আগাম শাস্তি দেওয়া কি সঙ্গত? নবাব এ সব কথা বলেছিলেন ইংরেজ রেসিডেন্টকে। তাঁর কথা নিশ্চয় উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

যা হোক, ওয়াজিদ আলি শাহ ওই এলাকার চাকলাদার আগা আলি খান আর স্থানীয় সামন্ত রাজা মান সিংকে ফৈজাবাদে মোতায়েন থাকতে নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন চার ব্যাটেলিয়ান বাদশাহি ফৌজ আর ২০টি কামান। যে কোনও মূল্যে হোক, রাজত্বে শান্তিরক্ষা করতে হবে, এই যেন তাঁর পণ।

ওয়াজিদ আলি হনুমানগড় সম্পর্কে তদন্তের জন্য কয়েকজন মৌলবিকে নিয়েও একটি কমিশন গড়েছিলেন। তাঁরা রায় দেন—হ্যাঁ, এক সময় হনুমানগড়ে একটি মসজিদ ছিল। দিল্লির এক ভূতপূর্ব বাদশা সেটি তৈরি করেছিলেন। বুরহান উল মুলুকের সময়েও একবার সেখানে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। হিন্দুরা তখন বলেন—মসজিদ নিয়ে তাঁরা কোনও ঝামেলা করতে চান না।

অন্যদিকে ওয়াজিদ আলি রাজা মান সিংকেও অনুরোধ করেছিলেন বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করতে। তদন্ত শেষে মানসিং জানালেন—ওখানে মসজিদ ছিল না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে কিছু দলিলও পেশ করলেন। প্রথমে যে হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম তদন্ত কমিটি বসানো হয়েছিল তার সিদ্ধান্তও বৈরাগিদের অনুকূলে গেল। ফলে আন্দোলনকারী মুসলমানরা ক্ষুব্ধ। মৌলবিরা উত্তেজনা ছড়াতে লাগলেন। অ্যাকশান

কমিটি গঠিত হল। আউধের মুসলমান এবং হিন্দু দুই সম্প্রদায়ই আবেগে উত্তেজনায় কম্পমান। রাজ্যের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

ওয়াজিদ আলি সমস্যায়। একদিকে হিন্দু। অন্যদিকে মুসলমান। হিন্দু বৈরাগিদের অধিকার মেনে নিলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হবেন। মুসলমানদের দাবি মেনে নিলে হিন্দুরা। তদন্তকারীরাও দেখা যাচ্ছে সকলে একমত নন। সুতরাং, আপসের প্রস্তাব দিলেন ওয়াজিদ আলি। তিনি বললেন—হনুমানগড় মন্দিরের দেওয়ালের ধারে মসজিদ তৈরি করা হবে। মসজিদের প্রবেশ পথ হবে মন্দিরের তোরণের উল্টো দিকে। মন্দির এবং মসজিদের মাঝখানে যে দেওয়াল সেটা উঁচু করা হবে। তাতে দু'তরফের নির্বিঘ্ন ধর্মাচরণের পথে কোনও বাধা থাকবে না। বাদশা আরও বললেন—দু'তরফ তাঁর কথা মেনে নিলে তিনি দুই দলকেই জায়গির দেবেন।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রস্তাব। মুসলমানরা এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হলেন। কিন্তু পত্রপাঠ বাদশাহের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন হনুমানগড়ের বৈরাগিরা। তাঁরা বললেন—ওখানে মসজিদ তৈরি হলে তাঁরা মন্দির ছেড়ে চলে যাবেন। শুধু তাই নয়, আউধে তাঁদের যেখানে যত মন্দির আছে সব তাঁরা শূন্য করে দেবেন। ক্ষোভ এবং অভিমানের কথা। ওয়াজিদ আলি স্বভাবতই থমকে দাঁড়ালেন।

ওদিকে আন্দোলনকারী মুসলমানরা মসজিদ তৈরির সময়সীমা জানতে চান। তাই শুনে ওয়াজিদ আলি ক্ষেপে গেলেন। কোনও চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করতে রাজি নন। বাদশা দু'দলের প্রতিনিধিদের লক্ষ্ণৌ ডেকে পাঠালেন।

অবশেষে দুই বিবাদী পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠক। বৈঠকের পর বৈঠক। তবু মীমাংসার কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষণ দেখে মনে হয়, বৈঠক মাসের পর মাস চললেও হনুমানগড় প্রশ্নের কোনও সুমীমাংসা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্য হল। বৈঠক বিফল।

আন্দোলনকারী মুসলমানরা এবার সরাসরি ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন। জেহাদ। ওয়াজিদ আলি আবার প্রমাদ গুনলেন। জেহাদের ডাকে তিনি সাড়া দিতে পারেন না। তাঁর প্রজারাও মেতে উঠুক তিনি তা চান না। তিনি দীর্ঘ প্রশ্নপত্র রচনা করে উত্তর চাইলেন আউধের একাধিক ধর্মীয় পুরুষের কাছে। তাঁর মূল প্রশ্ন—এই জেহাদ কি ইসলামি শাস্ত্রসম্মত ? ওঁরা উত্তর দিলেন—না, এই ধর্মযুদ্ধের আহ্বান সম্পূর্ণ অনৈতিক। তা মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র-বিরোধীও বটে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এটাও বললেন—মুসলমানদের যেমন এই প্রশ্নে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেওয়া ঠিক নয়, প্রজা হিসাবে হিন্দুদেরও উচিত নয় রাজকীয় নির্দেশ অমান্য করা। অর্থাৎ, বৈরাগিদের কর্তব্য মন্দিরের পাশে মসজিদ তৈরির বাদশাহি প্রস্তাব মেনে নেওয়া।

তবু রাজ্যে শান্তি ফিরে এল না। প্রবল উৎসাহে চলতে লাগল ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি। ওদিকে বৈরাগিরাও অটল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যদিও একই স্থান, একই মন্দির এবং মসজিদ, তৎকালের কোনও কাগজপত্রে কিন্তু 'রামজন্মভূমি' নামক কোনও শব্দের উল্লেখ নেই কোথাও। ওই মন্দির 'রামমন্দির' বলেও বর্ণনা করা হয়নি কোনও দলিলে। মন্দিরটি ছিল 'বৈরাগিদের', এবং তাঁরা মোহন্তের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানাদি করতেন। অন্যদিকে মসজিদটিকেও কেউ 'বাবরি মসজিদ' বলে উল্লেখ করেননি। মন্দির সেখানে যেমন শুধুই মন্দির, মসজিদও তেমনই শুধুই মসজিদ। রামচন্দ্র কিংবা বাবর দুটি নামই অনুচ্চারিত প্রতিদ্বন্দ্বী দুই তরফের মুখে!

ওয়াজিদ আলির সব উদ্যোগ ব্যর্থ হল। ৭ নভেম্বর, ১৮৫৫ সন। মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা এগিয়ে চললেন হনুমানগড়ের দিকে। তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়াল অযোধ্যার বাদশা ওয়াজিদ আলির ফৌজ। যে করে হোক, হিন্দু মন্দিরের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে, মুসলমান শাসক যেন এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাদশাহি ফৌজের সঙ্গে তুমুল লড়াই হয়ে গেল হনুমানগড়ের অদূরে। রক্তাক্ত লড়াই। কমপক্ষে তিনশ' থেকে চারশ' আক্রমণকারী নিহত হলেন বাদশাহি ফৌজের গোলায়। সরকারি পক্ষে হতাহত বিস্তর। নিহত—বাইশ, আহত—তিরাশি! আর একটি হিসাব বলছে সরকারি ফৌজের শতকরা তেত্রিশজন সিপাই-ই সে লড়াইয়ে নিহত কিংবা আহত। এভাবে রক্তের মূল্যেই সেদিন হনুমানগড়ে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। তিনি কি ক্লীব? উল্লেখ্য, হনুমানগড়ের লড়াইয়ে বাদশাহি ফৌজের সেনাপতি ছিলেন ক্যাপ্টেন বার্লো, ক্যাপ্টেন হুসেন আলি, ক্যাপ্টেন শীতল বক্স, ঠাকুর সিং এবং রাজা শের বাহাদুর। বাদশার খাস বাহিনীটির অধিনায়কও ছিলেন কিন্তু একজন হিন্দু,—ঠাকুর সিং ত্রিবেদী।

মেটিয়াবুরুজেও নবাব সমান উদার এবং মুক্ত দৃষ্টি। তাঁর প্রাসাদের নানা বিভাগের দায়িত্ব ছিল সুন্নিদের ওপর। বলতেন—শিয়া আর সুন্নি, আমার দুই চোখের দুই মণি। আর সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তো তিনি বলতে গেলে আর এক শাহান শা আকবর! তাঁর নৃত্যগীতের আসরে বিশিষ্ট হিন্দু রসিক এবং অভিজাতদের নিয়মিত নিমন্ত্রণ। ওয়াজিদ আলি শাহ কলকাতায় ছিলেন দীর্ঘ একত্রিশ বছর (১৮৫৬-১৮৮৭)। লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির সঙ্গে কলকাতার বাঙালি বড়মানুষদের সরাসরি পরিচয় ওই তিন দশকেই। কিছু কিছু বাঙালি অবশ্য অনেক আগেই মুসলিম রীতিনীতি এবং আদবকায়দা রপ্ত করেছিলেন। শুধু কৃষ্ণনগরের রাজসভায় নয়, অষ্টাদশ শতকে কলকাতার বিশিষ্ট পরিবারগুলোতেও মুসলিম সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটে। নিধুবাবুর সমসাময়িক গায়ক ও গীতিকার কালিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর মুসলমানি চালচলন এবং কথাবার্তার জন্য নাম পেয়েছিলেন কালী মির্জা বা কালী মজা। 'হুতোম' তাঁর সৃষ্ট অন্যতম চরিত্র প্যালানাথ

বাবু সম্পর্কে লিখেছেন—"ইংরেজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না ; মনে করেন ইংরেজি লেখাপড়া শেখা সুদ্ধ কাজ চালাবার জন্য ; মোসলমান-সহবাসে প্রায় দিবারাত্র থেকে থেকে ঐ কেতাই এর বড় পছন্দ। সর্বদাই নবাবী আমলের জাঁক-জমক, নবাবী আমীরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।" এটা ঠিক, শতকের প্রায় প্রথম থেকেই কলকাতায় আস্তানা পাততে বাধ্য হয়েছিলেন মহীশূরের রাজ্যহারা নবাবজাদারা। টালিগঞ্জে ছিল তাঁদের মস্ত পত্তন। ওদিকে চিৎপুরে এবং অন্যত্র ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবরাও। কিন্তু অভিজাত, কলাকুশলী, আমোদপ্রিয়, রসিক বাঙালির সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের নবাবের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা আর সহমর্মিতা তেমন বুঝি আর কারও সঙ্গে নয়। সম্ভবত লক্ষ্ণৌর আদবকায়দা, রীতিনীতি, বোল চাল এবং বিলাসব্যসনে বাঙালি বাবুরা আরও সড়গড় হয়ে ওঠেন ওয়াজিদ আলির কালেই। 'শরর্' সেকালের লক্ষ্ণৌর কয়জন বিশিষ্ট গায়িকার কথা উল্লেখ করেছেন। 'জোহরা এবং মুশতরীর গানের জবাব ছিল না। এঁরা কবিও ছিলেন। চুনেওয়ালী হায়দারীর এতো নামডাক ছিল, তাঁর কণ্ঠে 'সোয' শোনবার জন্য লোকেরা দিন গুনত মহরমের', লিখেছেন তিনি। এঁরা কি কলকাতায়ও খাতির পাননি ? অন্যত্র তিনি লিখেছেন—"আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ('শরর্'-এর জন্ম—১৮৬০) লখনউয়ের এক প্রখ্যাত বারবনিতা 'মুনসরিম ওয়ালী গ্যহর' কলকাতায় গিয়ে খুব নাম করেছিল। একটা আসরে আমি দেখেছি : পুরো তিন ঘণ্টা ধরে একই বিষয় গ্যহর এমন সুন্দরভাবে 'বিবৃত' করে গেল, দর্শকরা (মেটিয়াবুরুজের সমস্ত ঢুলী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ) আদ্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল ; ছোটরাও তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। 'জোহরা' ও 'মুশ্‌তরী' শুধু কবি বা গায়িকাই নয়, সুদক্ষ নর্তকীও ছিলেন। এবং 'জদ্দন' নৃত্যগীতে অন্তহীন মোহিনী।" এঁরা সবাই কিন্তু তারিফ কুড়িয়েছেন কলকাতার বাবুদের। আর, সম্ভবত এধরনের নৃত্যগীতে বাবুদের সত্যিকারের নেশা ধরিয়ে দেন ওয়াজিদ আলি শাহই। মহাবিদ্রোহের পরে তাঁরই প্রিয় প্রাসাদ কাইজার-বাগে যখন প্রবাসী বাঙালিবাবু আউধের অন্যতম তালুকদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রিয় বশংবদ হিসাবে ইংরাজের আতিথেয়তা ভোগ করছেন মেটিয়াবুরুজে নবাবের মাইফেলে তখন বাহারি তাকিয়া হেলান দিয়ে ঢুলছেন সঙ্গীত-রসিক সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মহারাণি ভিক্টোরিয়ারও অনুগত তিনি, কিন্তু একই সঙ্গে যেন তাঁর সমান আনুগত্য সিংহাসনহারা এই সঙ্গীতবিলাসী নবাবের প্রতি। উল্লেখ্য, কলকাতায় যদি বাঈ নাচ চালু করে থাকেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, তবে বাঙালি ভদ্রজনদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্তানি সঙ্গীত প্রসারে বিশেষ ভূমিকা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। ১৮৭১ সনে তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল মিউজিক স্কুল।

সঙ্গীত-রুচি ছাড়া মেটিয়াবুরুজের নবাব হয়তো আরও নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন কলকাতা-সংস্কৃতি। হয়তো মহরমের মিছিল, হোলি থেকে শুরু করে, সেদিনের বুলবুলের লড়াই, পায়রা-বিলাস, এমন কি পান তামাক পোশাকেও খুঁজে পাওয়া যেত লক্ষ্ণৌ-কালচারের রেণু। আজ আর চট করে সেই লক্ষ্ণৌ-হাওয়া পরিমাপের উপায় নেই। বড়জোর চিকনের শাড়ি পাঞ্জাবি বা পান মশলায় তার রেশটুকুই থাকতে পারে। তবে অনুমান করতে অসুবিধে নেই, ঘরের কোণের দ্বিতীয়-লক্ষ্ণৌর ফুরফুরে হাওয়া নিশ্চয়ই মৃদুমন্দ বইছিল ইংরাজের এই শহরে।

ওয়াজিদ আলি কলকাতায় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নম্র এবং বিনয়ী স্বভাবের জন্য। তাঁর আমলেই আলিপুরের চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা। ওয়াজিদ আলি সরকারি চিড়িয়াখানায়ও হাজির হতেন মাঝে মাঝে। হয়তো নিজের চিড়িয়াখানার সঙ্গে তুলনা করতেন সদ্য গড়ে তোলা ওই চিড়িয়াখানার। তিনি আসতেন রিকশর মতো একটি যান চড়ে। আটজন লোক তাঁর সেই বাহন টানত। চিড়িয়াখানার পরিচালক তখন সুখ্যাত বাঙালি প্রাণী-বিশারদ রামব্রহ্ম সান্যাল। নবাবের রিকশার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঁটতেন। নবাবকে জীবজন্তু দেখাতেন। নবাব একদিন তাঁকে বললেন—বাসুসাহেব, আপনি ভাববেন না যে, আমি নিজেকে নবাব বলে মনে করি বলেই এভাবে গাড়ি চড়ে ঘুরছি আর আপনাকে হাঁটিয়ে কষ্ট দিচ্ছি। আপনিও শরিফজাদা, আমার উচিত আপনার সঙ্গে পায়ে হাঁটা। কিন্তু কী করব, আমার বয়স হয়ে গেছে, শরীর দুর্বল, হাঁটবার ক্ষমতা নেই, তা-ই এই বাহন। আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না। সান্যাল মশাই, বলা বাহুল্য, অভিভূত। ঠিক তেমনই অন্যরাও। ওয়াজিদ আলি তাজ-এবং তখত্-হারা শাপভ্রষ্ট কোনও দেবতা যেন। তাঁর জন্য সকলের সশ্রদ্ধ ভালবাসা। এ ব্যাপারে কোনও ফারাক নেই লক্ষ্ণৌর সঙ্গে কলকাতার।
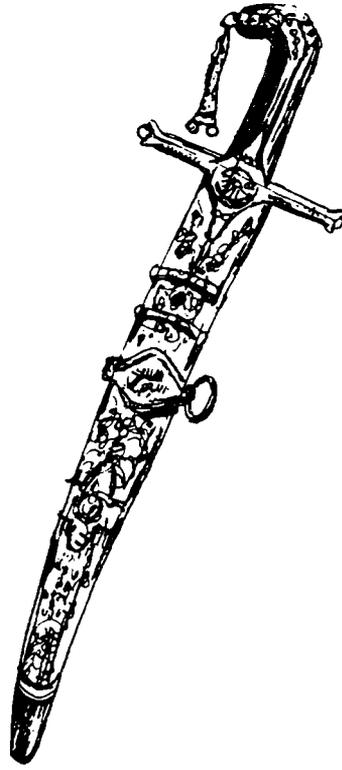
এমনকি এখনও। ওয়াজিদ আলির মৃত্যু ১৮৮৭ সনে। ততদিনে স্লিম্যান, উট্রাম, ডালহৌসি—সবাই বিদায় নিয়েছেন এই দুনিয়া থেকে। ঐতিহাসিক সেই নাটকের কুশীলবদের মধ্যে দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন শুধু তিনি। এবার তিনিও বিদায় নিলেন।

ওয়াজিদ আলি শাহর মৃত্যু ১৮৮৭ সনে। ভাটনগর বলছেন মৃত্যুদিন ১ নভেম্বর। তারিখটি, মনে হয়, ঠিক নয়। কেন না, ওয়াজিদ আলির মৃত্যুর পর অক্টোবরের ৩১ তারিখে কলকাতার 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' তাঁর অন্তিমযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে জানাচ্ছে, শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ বাহাদুর, আমির হুসেন, আমির আলি, মৌলবি মোহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, হাজি নুর মোহম্মদ জ্যাকেরিয়া, প্রিন্স রহিমউদ্দিন, ফারুক শাহ, আনোয়ার শাহ, নবাব মির মোহম্মদ আলি খান এবং শহরের আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ১ নভেম্বর 'এ এ' নামে একজন পত্রলেখক কলকাতার আর একটি কাগজে জানাচ্ছেন—এ বিবরণ সত্য নয়। আনোয়ার শাহ এবং কয়েকজন সাহেবজাদাকে বাদ দিলে শবযাত্রায় শহরের গণ্যমান্যরা বিশেষ কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবে এই পত্রলেখকও স্বীকার করেন শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। তার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন সফিরউদ্দৌলা এবং দিন মোহম্মদ খান বাহাদুর।

মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সে সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'দি স্টেটসম্যান' পত্রে, নভেম্বরের ৩ তারিখে। অনুষ্ঠানের আগে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারী কে, সে প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন ছিল। অধিকারী অনধিকারী নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের তরফে একজন ইংরেজ কর্নেলের ওপর। তিনি নবাবের পরিবারপরিজনদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক শেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন প্রয়াত বাদশার জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স কমর কদ্র বাহাদুর। প্রধান বেগম খাস মহলও তাঁর অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। খবরে বলা হয়—অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি ঘটবে না। সরকার বাহাদুর অনাবশ্যক জাঁকজমকে অর্থের অপচয় চান না বটে, কিন্তু প্রথা এবং ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী যা প্রয়োজন তার সবই করা হবে। দরিদ্র ভোজনের জন্য নবাবের রসুইখানায় সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ভূতপূর্ব বাদশার মৃত্যুর পর কয়েকটি প্রাসাদে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছিল। মহিলাদের জন্য সেগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যাতে অনায়াসে ইমামবাড়ায়, অর্থাৎ নবাবের সমাধিস্থলে যাতায়াত করতে পারেন তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইত্যাদি।

অযোধ্যার রাজ্যহারা বাদশার মৃত্যু যে কলকাতাবাসীর অগোচরে ছিল তা মনে হয় না। কারণ, অক্টোবরের ১০ তারিখে (১৮৮৭) 'দি স্টেটসম্যান' কাগজে দেখি 'জাস্টিস' ছদ্মনামে একজন একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যদিও তিনি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, তবু তিনি প্রয়াত ওয়াজিদ আলি শাহ'র প্রতি অতিশয় সহানুভূতিশীল। তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগত ধন সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। তার বদলে তাঁকে বন্দী করে রেখে সম্পূর্ণত পেনশন-নির্ভর করে রাখা হয়েছিল। একজন নরপতির পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! প্রয়াত নবাবের জন্য অনেক অশ্রুপাত করার পর 'জাস্টিস' বলছেন—উত্তরাধিকারীদের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণের নামে কমিশন বসানোর সরকারি প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর মতে নবাবের জন্য যে পেনশন মঞ্জুর ছিল তার সঙ্গে মাসে আর ৩৫ হাজার টাকা যোগ করলেই ওয়াজিদ আলি শাহের উত্তরাধিকারীদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে।

তার আগে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য নিয়ে একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। বক্তব্য : ভূতপূর্ব বাদশার জন্য মাসে বরাদ্দ ছিল মাত্র এক লক্ষ টাকা। তা থেকে পরিবারের সদস্যদের নামে বেশ কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয়। গোড়ায় সব টাকা ভূতপূর্ব বাদশার হাতেই দেওয়া হত। যাঁকে যা দেয় তিনিই বিবেচনা করে তা দিতেন। ক্রমে বিলিবন্দোবস্ত নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। সরকার তদন্তের

জন্য একটি কমিশন বসান। কমিশনে দু'জন ইংরেজ রাজপুরুষ ছাড়াও ছিলেন আমির আলি। কার কত প্রাপ্য তাঁরাই তা স্থির করে দেন। গার্ডেনরিচে বাদশার জ্যেষ্ঠপুত্র পেতেন মাসে তিন হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুত্র তিনশ' টাকা, বারো বছর বয়সে পৌঁছালে অন্য পুত্ররা পেতেন মাসে দেড়শ' টাকা। কন্যারা, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বেগমরা কী হারে পাবেন কমিশন তা-ও ধার্য করে দেন। প্রধান বেগমের প্রাপ্য ছিল জ্যেষ্ঠতনয়ের পরেই। জ্যেষ্ঠ নবাবজাদা অবশ্য এক বছর আগেই মৃত। অন্যদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার পর ভূতপূর্ব বাদশাকে দেওয়া হত মাসে সত্তর হাজার টাকা। সরকারকে এবার ভাবতে হবে, নবাব নিজে যা পেতেন সেই অর্থের কী হবে। সম্পাদকীয়তে বলা হচ্ছে—রাজসরকার ইচ্ছা করলে ওই টাকা নিজেদের কাছেই রেখে দিতে পারেন, কিংবা একাংশ রেখে বাকি অর্থ আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন, কিংবা পুরো অর্থই বিলিবণ্টন করতে পারেন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হবে বলে মনে হয় না। তবে সম্পাদকের আশা—সমতা রক্ষিত হবে, এবং উত্তরাধিকারীরা ন্যায় বিচার পাবেন।

কিন্তু উত্তরাধিকারীরা ন্যায় বিচার পেয়েছিলেন কি ? উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হলেন ভূতপূর্ব নবাবের জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র কমর কদ্র। পুরো নাম—কমর কদ্র মির্জা আবিদ আলি বাহাদুর। যুবরাজ হিসাবে তিনিও পিতার হারানো সিংহাসনের জন্য দরবার করতে গিয়েছিলেন লন্ডনে। ওয়াজিদ আলি যথাসম্ভব ইংরাজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। কমর কদ্র এদিকে পরিণত হয়েছেন ইংরাজের ভক্তে। ১৮৫৮ সনের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌয় ইংরাজদের বিজয় উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সাধ্য কী বাঁচিয়ে রাখেন মেটিয়াবুরুজের জৌলুস। অনেক দাবিদার নবাবের সম্পত্তি এবং অর্থে। সরকার এক পেনশন-কমিটি বসিয়েছিলেন নবাবের মৃত্যুর বছরই (১৮৮৭)। কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন ১৮৮৮ সনের ৫ জানুয়ারি। তাতে জানা যায় মেটিয়াবুরুজে আসার পর ওয়াজিদ আলি শাহ 'মুতআ' পদ্ধতিতে বিয়ে করে দু'শ একান্নটি মেয়েকে তাঁর হারেমে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাদের অনেক ছেলেমেয়ে। প্রতিবেদনে বলা হয় সে দলে আঠারো বছরের বেশি যাদের বয়স এমন পুত্রসন্তান রয়েছে পনেরো জন। আঠারোর নীচে আছে আরও চারটি ছেলে। ওয়াজিদ আলি শাহ যখন লক্ষ্ণৌয় গদিয়ান ছিলেন তখনও তাঁর বেশ কয়েকজন পুত্রসন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন রয়েছেন মেটিয়াবুরুজে। আর, নেপালে পলাতক বিরজিস কদ্রকে বাদ দিলে কমর কদ্রই জ্যেষ্ঠ। যদিও আউধে আজ আর কেউ 'বাদশা' নন, কেউ আর সে উপাধির অধিকারী নন, তবু ভূতপূর্ব বাদশার উত্তরাধিকারী হিসাবে কমর কদ্রকে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। কারণ, আউধে নিয়ম ছিল যদি নবাবের কোনও পুত্র বা ভাই তাঁর

জীবৎকালে দেহরক্ষা করেন তবে তাঁর বংশধরেরা কখনও সিংহাসন বা খেতাব দাবি করতে পারত না। তাদের বলা হত—'মাহজুব-উল-ইরস' (Mahjoob-ol-Irs)। সেদিক থেকে বিচার করলে ভূতপূর্ব বাদশার দুই পুত্র হামিদ আলি এবং ফারিদুন কদ্রর সন্তানেরা উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হতে পারে না। বাদশার ভাই মির্জা হাসমত সিকান্দরের সন্তানেরাও না। সুতরাং, ইংরাজরা মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা বরাদ্দ করে দিল কমর কদ্রের জন্য। ইতিমধ্যে ১৮৯২ সনে নেপাল থেকে মেটিয়াবুরুজে এসে হাজির হলেন নবাবের আর এক সন্তান, সাতান্নর মহাবিদ্রোহের নেত্রী বেগম হজরত মহলের পুত্র বিরজিস কদ্র। বিদ্রোহীরা তাঁকেই আউধের নবাব বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিরজিসও ওয়াজিদ আলি শাহর উত্তরাধিকারী। কিন্তু নিজের দাবি আদায় করার আগেই আচমকা বিদায় নিতে হল তাঁকে। মেটিয়াবুরুজে এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ঘরে ফিরে সেই যে তিনি শয্যা নিলেন আর উঠতে পারলেন না। অনেকেরই ধারণা সম্পত্তির লোভে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁকে। কমর কদ্রর মাসোহারা তিন হাজার টাকা থেকে বেড়ে তখন হয়ে যায় চার হাজার টাকা। কিন্তু অন্যদের সামাল দেওয়া মুশকিল। চারদিকে দাবিদার। এই সব দেখে শুনে উত্তরাধিকারীদের দাবিদাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার নামে সরকার এক সিন্ডিকেট গড়ে ভূতপূর্ব নবাবের যাবতীয় সম্পত্তি তুলে দিলেন তার হাতে, বিক্রির জন্য। রইল শুধু কিছু দেবোত্তর বিষয় আর কয়টি ধর্মস্থান। বাকি প্রাসাদ বাগবাগিচা সব বিকিয়ে গেল জলের দামে। নবাবি-মেটিয়াবুরুজের প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। ডক, পাটকল, কুলিঘাট বা বিদেশে দাস-শ্রমিক চালান দেওয়ার জেটি, রেল অফিস—দেখতে দেখতে এক পাঁচ মিশেলি শহরতলির চেহারা দ্বিতীয়-লক্ষ্ণৌর। ওয়াজিদ আলি শাহের কয়টি প্রাসাদ নাকি কিনে নিয়েছিলেন তৎকালের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি। নবাবের নিজের মহল ভেঙে সেখানে বসে ভিক্টোরিয়া জুট মিল। মহারানির বাহাদুরি ছিল বটে! ওই সব প্রাসাদ যাঁরা কিনেছিলেন তাঁরা কি জানতেন, একদিন গ্যাসের আলোয় তাঁর প্রাসাদগুলোকে সাজাতে চেয়েছিলেন ওয়াজিদ আলি। লাইন পাতা সারা। অন্যান্য আয়োজনও সম্পূর্ণ। কিন্তু বাদশাহের নাসিকা বাদ সাধল। ওয়াজিদ আলি সাফ জানিয়ে দিলেন এই বদ গন্ধ তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। সুতরাং, বিস্তর অর্থের বিনিময়ে গড়ে তোলা ব্যবস্থাটি বাতিল হয়ে গেল।

দ্বিতীয়-লক্ষ্ণৌ ওয়াজিদ আলি শাহর সাধের মেটিয়াবুরুজের সেই অবলুপ্তির সংবাদ এখনও হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে বিবর্ণ খবরের কাগজের পাতায়। তার মধ্যে কয়েকটি :—

১৮৮৭'র ২৭ নভেম্বরে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রে লেখা হচ্ছে ভূতপূর্ব বাদশা

ওয়াজিদ আলি শাহ যখন বেঁচে ছিলেন তখন শহরের অতি অল্প জনই তাঁর প্রাসাদ এলাকায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেতেন। এখন সরকারি এজেন্ট কর্নেল প্রিদোর সৌজন্যে যে কেউ ঘুরে বেড়াতে পারেন তাঁর উদ্যানে। অবশ্য তার আগে আসাদমঞ্জিলের তোরণ থেকে একটি টিকিট সংগ্রহ করা দরকার। হয়তো কর্নেলকেও দেখা যাবে বাগানে। তিনি দর্শকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন সকৌতুকে। এই কর্নেলকেই বিক্রি করতে হবে নবাবের চিড়িয়াখানার রকমারি জন্তু-জানোয়ার, সরীসৃপ এবং পক্ষিকুলকে। এখানে এমন টিয়াও রয়েছে যে কথা বলে শুধুই হিন্দুস্তানিতে।

১৮৮৮'র ডিসেম্বরের 'দি স্টেটসম্যান'-এ বের হয় চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারের বিক্রির খবর। বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেসার্স মিলটন অ্যান্ড কোং। তখনও নাকি সব জন্তু-জানোয়ার পাখপাখালি বিক্রি হয়নি, তাই এই বন্দোবস্ত। সংবাদে বলা হচ্ছে বিক্রি শুরু হবে সকাল ১১টায়। সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য খিদিরপুর পর্যন্ত বিশেষ ট্রামচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিলামের জায়গায় জলপানের জন্য শিবির খোলা হচ্ছে। সুতরাং, কারও কোনও অসুবিধা হবে না। বলা হচ্ছে—প্রথম দিন বিক্রি হবে ২০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পায়রা !

২০ ডিসেম্বরেও দেখা যায় চিড়িয়াখানার উচ্ছেদপর্ব তখনও শেষ হয়নি। এবার নাকি বিক্রি হবে নানা জাতের বিচিত্র সব পাখি। দাম খুবই শস্তা। সংবাদদাতার আশা, ক্রেতারা এ সুযোগ হারাবেন না।

ক্রমে একে একে অন্যান্য সম্পত্তিও বিক্রি হয়ে যায়। ১৮৯০ সনের ২৩ ডিসেম্বর 'দি স্টেটসম্যান'-এর একটি খবর থেকে জানা যায় ভূতপূর্ব বাদশার জমিজিরাতও বিক্রি হয়ে গেছে। নদীর ধারে গার্ডেনরিচে ২৫৭ বিঘা জমি, ঘোড়ার গাড়িতে কলকাতা থেকে মাত্র তিরিশ মিনিটের রাস্তা !

এভাবেই কয়েক বছরের মধ্যে মুছে দেওয়া হয়েছিল ওয়াজিদ আলি শাহের মনের রঙে রাঙানো মেটিয়াবুরুজ নামে রঙিন ছবিটি।

আজকের মেটিয়াবুরুজ আরও এলোমেলো, আরও বিশৃঙ্খল। আকাশে জাহাজের ধোঁয়া, ক্রেনের আঁকিবুকি। ডক। ব্যস্ত কলকাতা বন্দর। তা পার হতে না হতে ওয়াটসনের জাহাজ কারখানার বদলে বিশাল গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপ। উঁচু দেওয়ালের আড়ালে বিপুল কর্মকাণ্ড। রকমারি আওয়াজ। এদিকে বস্তির পর বস্তি। সার সার একতলা বাড়ি। খোলা নর্দমা। হাজা পুকুর। মজে যাওয়া ইটের বাড়ি। তার মধ্যে কীটের মতো কিলবিল করছে মানুষ। বেশির ভাগই গরিব। ভাঙা ছাতা। ছেঁড়া লুঙি। তেলহীন রুক্ষ চুল। নর্দমার ধারে বসে নেংটো ছেলে। কোথায় সেই নবাবি আমলের মেটিয়াবুরুজ ?

'সেই মেটিয়াবুরুজের মৃত্যু হয়েছে'—লিখেছিলেন 'শরর্'। সেই কবে, কোনকালে তিনি লিখেছিলেন—"আপনি ওখানে গিয়ে এখন ধুলো সরান, কিছুই চোখে পড়বে না। আপনার দৃষ্টি যদি বিগত সেই জীবন ও তার সৌন্দর্য খোঁজে তো ইমরো-উল-ক্যসকে (একজন প্রাচীন কবি) ডেকে আনুন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনাকে শোনাবেন : এইখানে ছিল 'মুরস্‌সা মঞ্জিল', এইখানে 'নূর মঞ্জিল', এইখানে 'সুলতান খানা', এইখানে ছিল 'আসাদ মঞ্জিল', ওইখানে কবিদের 'মুশাইরা' হত, ওইখানে হত বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের সমাবেশ, ওখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ব্যস্ত থাকতেন পরিহাসে-বিনোদে, আর ওইখানে জাদুসঞ্চারী কবি ও লেখক আপন আপন নিপুণতা প্রকাশ করতেন। ওই স্থানে বিশ্ব-সুন্দরীদের মেলা বসত, ওই জায়গায় নাচগান হত, ওখানে পরীর মতো সুন্দরী মেয়েদের নাচগান শেখান হত, আর এখানে জাঁহাপনাহ তাঁর রূপসী 'মুত্-আশুদা' বেগমদের মাঝখানে বসে জলসা করতেন। এই জায়গায় আফীমচীদের জমায়েতে উছ্‌লে উঠত গল্পের পর গল্প। ওখানে থাকত বটেররা, এখানে পায়রা উড়ত ; আর ওইখানে 'কনক্যওআর' ময়দানে ধরা হত বাজী। এই দেউড়ীতে চোখে পড়ত : পর্দার পাশ দিয়ে মুখটি বার ক'রে চন্দ্রমুখীদের লোচনপাত : ওই দেউড়ীতে 'মামা-অসীলের' (রাঁধুনি) সপদদাপে যাতায়াত। এই দেউড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিশেষ কবি—অন্তঃপুরচারিণী 'মহলসরার মালিক' বড়ো ভালবাসেন কবিতাকে। ওই দেউড়ীতে প্রত্যহ খোঁজ পড়ে নবীন রংদার লিপিকরের—এখান থেকে নব নব রসের 'নোদুনামা' (প্রেমপত্র) গিয়ে হাজির হবে বাদশাহ-সকাশে।"

স্বভাবতই সে মেটিয়াবুরুজ আজ কল্পনায়ও আনা যায় না। ওয়াজিদ আলি শাহ দেহরক্ষা করেছেন মাত্র একশ তিন বছর। তবু কোনও কল্পনা বিলাসীর পক্ষেই সম্ভব নয় আজকের ধূলিশয্যায় তাঁর মেটিয়াবুরুজের পুনর্নির্মাণ। ছন্নছাড়া শহরতলি। হতশ্রী পরিবেশ। ছন্দহীন জীবন। কলের বাঁশি। হই হট্টগোল। ফেরিওয়ালার হাঁকডাক। মাটি কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে ঝুলন্ত মানুষ নিয়ে বাসের ছুটোছুটি। সাধারণ দোকানপাট। থেলো হুঁকো। অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। শস্তা লাল ফিতে। আশ্চর্য, তারই মধ্যে এখনও বেঁচে রয়েছেন ওয়াজিদ আলি শাহ। বাংলা বাজারের রণহিংস্র নৈরাজ্যকে অগ্রাহ্য করেই এখনও তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত সিবতানাবাদ ইমামবাড়া মৎস্য-প্রতীক শোভিত তাঁর বিশাল তোরণ নিয়ে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সনে। শিল্পীরা এসেছিলেন নাকি সুদূর ইরান থেকে। এখানেই শায়িত লক্ষ্ণৌর শেষ 'বাদশা', মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। শ্বেতপাথরের চত্তর পেরিয়ে ইমামবাড়ার মূল ঘর। বাঁয়ে নানা অলঙ্কারে শোভিত নবাবের সমাধি। অবান্তর জঞ্জালের মতো

একপাশে পড়ে রয়েছে 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ি'র গিল্টিকরা নকল সিংহাসন। আরও একটি অবান্তর জিনিস ঠাঁই পেয়েছে একালে। শ্বেতপাথরে খোদাই করা কলকাতায় ব্রিটিশ দূত, ডেপুটি হাইকমিশনারের একটি শুভেচ্ছাবাণী। তাতে রীতিমত বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা। বোধহয় প্রয়োজন ছিল না এই সন্ধিপত্রের। এখানেই ঘুমিয়ে আছেন বিরজিস কদ্র এবং তাঁর বেগম নবাব মহতাব আরা। তিনি ছিলেন দিল্লির শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের একজন নাতনি। পাশাপাশি, কাছাকাছি শুয়ে আছেন আউধ-বংশের আরও কেউ কেউ। শ্বেতপাথরের মেঝেয় কালো রেখায় চিহ্নিত তাঁদের সমাধি। ছাদ থেকে ঝুলছে কাচের অসংখ্য রঙিন বাতিদান, লণ্ঠন। অন্যদিকে মহরমের মিছিলের নানা আয়োজন। তাজিয়াদারির রকমারি সাজসরঞ্জাম। সবই সযত্নে এবং সশ্রদ্ধায় পরিকল্পিত। সব আয়োজনই শিল্পরুচির পরিচায়ক। দেওয়ালে কিছু ধর্মীয় ছবি। তবে আর সব কিছুর আগে প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নেয় ওয়াজিদ আলি শাহের একটি প্রতিকৃতি। এটি অনেকেরই অদেখা। বর্ষীয়ান নবাব সোজাসুজি তাকিয়ে আছেন দর্শকের দিকে। তাঁর চোখে মুখে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

ওপর তলায় ইমামবাড়া ট্রাস্ট অফিস। অন্য দিকে সভাকক্ষ এবং লাইব্রেরি। সিব্যয়তনাবাদ ট্রাস্ট গঠিত হয় ১৯০১ সনে। এই সেদিন পর্যন্তও ট্রাস্টের পুরোভাগে ছিলেন কমর কদ্রর বংশধরেরা। অর্থাৎ, ইংরাজরা যাদের নবাবের অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিয়েছিল তাঁর উত্তরপুরুষরা। বিরজিস কদ্রর বংশধরদের একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৯৭৪ সনে শেষ পর্যন্ত বিরজিস কদ্রর বংশধরেরা ট্রাস্টের অধিকার নিজেদের হাতে পান। বিরজিস নিহত হন ১৮৯৩ সনে। তাঁর পুত্র মেহের কাদের ভারতের স্বাধীনতা দেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যু ১৯৬১ সনে। ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট তিনি সবিনয়ে ঘোষণা করেছিলেন—জনগণই আমার প্রভু। অন্য দিকে মেটিয়াবুরুজে তখন নাটকীয়ভাবে নিজেকে আউধের নবাব বলে ঘোষণা করেন নবাবের এক বংশধর মির্জা মোহম্মদ বাবর। এই ইমামবাড়াতেই তিনি নাকি স্বাধীন আউধের ঘোষণা করেছিলেন, মাথায় পরেছিলেন রাজমুকুট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি পাকিস্তানে চলে যান। এই ইমামবাড়াকে ঘিরে আরও নানা কাণ্ড। ১৯৭৪ থেকে অবশ্য পরিস্থিতি পরিবর্তিত। তখন থেকে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বিরজিস কদ্রর পৌত্র প্রিন্স আঞ্জুম কাদের। তাঁর আর দু'জন ভাই ডঃ কাউকাব কাদের এবং প্রিন্স নায়ের কাদেরও ট্রাস্টের সদস্য। কথা হচ্ছিল প্রিন্স আঞ্জুম কাদেরের সঙ্গে। বলছিলেন নবাবের স্মৃতির যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন ওঁরা। অবহেলা আর উদাসীনতায় ইতিমধ্যেই ইমামবাড়ার অনেক মূল্যবান স্মারক নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। যৎসামান্য যা

আছে তাঁরা সযত্নে আগলে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছে আছে মেটিয়াবুরুজে একটি ছোটখাটো স্মৃতিশালা গড়ে তোলা। আপাতত সেকালের স্মারক বলতে আছে এই ইমামবাড়া, শাহি মসজিদ, বিতুল নাজাল, কুয়াসরুল বুকা আর বেগম মসজিদ। আর স্মারক বলতে ইমামবাড়ায় রক্ষিত নবাবের কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং কিছু বই। দেখছিলাম নিজের লেখা বইয়ের পাতায় নবাবের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির সিলমোহর। তাতেও জোড়া-মাছ।

ওঁরা বলছিলেন মেটিয়াবুরুজে এখনও রয়েছে লক্ষ্ণৌর কিছু কিছু খানদানি পরিবার। চতুর্থ প্রজন্ম চলছে তাঁদের। দু'একজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। 'শরর্' বর্ণিত সেই 'নিশস্ত-বরখাস্ত্' বা সৌজন্য, সেই 'তরয-কলাম' বা আলাপ সম্ভাষণ। এখনও সেই 'পহলে আপ', পহলে আপ', এখনও সেই অলঙ্কারে সাজিয়ে আলতো ভাবে মিষ্টি করে কথা বলা। 'শরর্' লিখেছিলেন—"বাইরের লোক স্বীকার করে তারা লক্ষ্ণৌর লোকেদের সামনে কথা বলতে সংকোচ বোধ করে, যা কিছু শিষ্টতা শিখেছে, সব ভুলে যায়। তারপরেই যখন নিজেদের আড্ডায় বসে, তখন এই বলে নিজেদের অক্ষমতার বদনাম ঢাকতে চায় যে,—'আমি সরলভাবে সোজাসুজি কথা বলি, লখনউওয়ালাদের মতো এমন অ্যায়সা-ত্যায়সা আমার আসে না।' সত্যি বলতে কি, এই বাহানা ওই বদনামকে খণ্ডন নয়, মণ্ডনই করে।" যে কোনও গর্বিত লক্ষ্ণৌওয়ালা শুনলে খুশি হবেন শতবর্ষ পরেও এখনও মেটিয়াবুরুজে কিছু কিছু মানুষ বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই সব পুরানো দিনের আদব কায়দা, কথা বলার সেই সুকুমার আর্ট। লক্ষ্ণৌ এবং কলকাতার মধ্যে এখনও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন ওঁরা। লক্ষ্ণৌর বাসিন্দারা যেমন সবাই জানেন মেটিয়াবুরুজের কথা, মেটিয়াবুরুজের অনেকেই তেমনই খবরাখবর রেখে চলেছেন লক্ষ্ণৌর। কিছু কিছু শিল্পী এবং কারিগরদের বংশধররাও রয়েছেন এখানে। অধিকাংশই নির্মম কালের পীড়নে পেশা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কেউ কেউ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন পুরানো দিনের কারুশিল্পের ঐতিহ্য। ওয়াজিদ আলির স্মৃতি যেন কিছুতেই মুছবার নয়। ফেরার পথে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল তার। সদর রাস্তার ওপর একটি ঝকঝকে তকতকে পানের দোকান। দোকানি মতিলাল শ্রীমালীকে স্থানীয় লোকেরা বলেন—শাহি পানওয়ালা। তিনি নিজেও দাবি করেন তাঁর পূর্বপুরুষরাই একদিন গোলাবি খিলি সরবরাহ করতেন ওয়াজিদ আলি শাহকে। তাঁর দোকানে এখনও ঝুলছে ওয়াজিদ আলি শাহের একাধিক প্রতিকৃতি। একটিতে তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। পিছনে নদী। নদীর জলে ভাসছে ময়ূরপঙ্খী। ওপারে কোম্পানির বাগান। খদ্দের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। পানওয়ালা পান মশলা সাজাতে সাজাতে বলে যান ওয়াজিদ আলি শাহের নানা কাহিনী। এভাবেই

তিনি এখনও মেটিয়াবুরুজে বেঁচে আছেন আমজনতার কাছে।

বেঁচে আছেন এই শহরের অন্যত্রও। সর্বত্র। উনিশ শতকের বাঙালিবাবুরা আজ আর বেঁচে নেই। সুতরাং সেকালের সেই পায়রা-বিলাসও আজ আর নেই। অনুমান, ওয়াজিদ আলি শাহই এই বাবুয়ানায় দীক্ষিত করেছিলেন তাঁদের। তার জের এখনও কিন্তু রয়েছে কিছু কিছু। সেটা বোঝা যায় ছুটির দিনে উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজারে পায়রা বেচা-কেনার বহর দেখলে। সেখানে লক্কা, গেরোবাজ, হিরামন এসব কথা এখনও ভেসে বেড়ায় হাটের হাওয়ায়। এমন কি পৌষসংক্রান্তির ভোরে এখনও বাবুদের বাড়ির শতচ্ছিন্ন অঙ্গনে শুরু হয় বুলবুলের লড়াই। চলে দুপুর অবধি। সে খেলায় হয়তো কোনও ছাতুবাবু বা লাটুবাবু আর যোগ দেন না, কিন্তু তাই বলে দর্শকের অভাব হয় না। এ নেশাও সম্ভবত ওয়াজিদ আলি শাহর কাছ থেকে পাওয়া। ঘুড়ি ওড়াবার এই যে সর্বজনীন নেশা, তার পিছনেও সম্ভবত মেটিয়াবুরুজ। চিকনের কাজ করা শাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি। জরির নকশাকাটা ভেলভেটের জুতো, সবই শাহী শিল্পীদের মারফত লক্ষ্ণৌ থেকে পাওয়া। বাবুয়ানার এই সাজ এখনও কিন্তু বিস্মৃত নয়। এই শহরে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে ওয়াজিদ আলি শাহর ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়নি এই খবরটুকু যে, শীতের রাতে তবক দেওয়া গোলাবি খিলি গালে পুরে গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি-পরা যে বাবুরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন, তাঁদের কাছে মেটিয়াবুরুজের নবাবের নামটি উল্লেখ করা মাত্র প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নতুন খবর শোনাতে পারেন। হ্যাঁ, তাবৎ রসিকের কাছে ওয়াজিদ আলি এখনও একটি স্মরণীয় নাম। এখন হামেশাই আসরে আসরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় সেই নাম।

আর লক্ষ্ণৌ ?

শেষ করার আগে ওয়াজিদ আলির বিদায়ের পরে লক্ষ্ণৌর সেই দাউ দাউ আগুনের দিনগুলোর কথা। নবাব গান লিখেছিলেন—'মহল মহল বেগম রোয়েঁ,/গলি গলি রোয়েঁ পাথুরিয়া।' সত্যি সত্যিই নাকি তাঁর জন্য কেঁদেছিল এমনকি চকের মেয়েরাও। উমরাও জান বলেছে, রাজত্বের অন্তকালে নবাবজননীর কাছে সে বিষাদ সঙ্গীত গাইত। মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ত নবাবের ভাই মির্জা সিকান্দর হাসমতের আসরেও। ওঁরা লন্ডনের পথে কলকাতা চলে গেলেন। উমরাও জান বলছে তারপরই এল প্রলয়ের দিন। ১৮৫৭'র ফেব্রুয়ারিতে গালিব লিখেছিলেন—আমি আউধের কেউ নই। তবু এই রাজ্যের হাল দেখে আমি বিষণ্ণ। আমার ধারণা, যে কোনও ভারতীয়, ন্যায়বিচারে যাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা আছে তিনিই বিষণ্ণ বোধ করবেন আউধের চলতি অবস্থা দেখে। ওয়াজিদ আলি শাহ কবিকে বার্ষিক পাঁচশ' টাকা বৃত্তি দিতেন। মির্জা গালিব লক্ষ্ণৌর নাম দিয়েছিলেন—'পুবের বোগদাদ।'

সেই লক্ষ্ণৌয় নবাব নেই। দুঃখে প্রজারা গান বাঁধল। দুঃখের গান। পরবর্তী কালে উইলিয়াম ক্রুক নামে একজন ভূতপূর্ব ইংরাজ আই সি এস তার কিছু কিছু সংগ্রহ করে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটির সারমর্ম শোনার মতো।

একটি গানে বলা হয়েছে—হে শ্রীপতি মহারাজ (রাম) চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা

করার ক্ষমতা আছে একমাত্র তোমারই। তুমি বল কখন আর প্রভু (নবাব) ফিরে আসবেন তাঁর আপন রাজে ? (পথে) প্রথমে তিনি থেমেছিলেন কানপুরে, দ্বিতীয় বিরতি বারাণসীতে, তৃতীয়—কলকাতায়। বেগমরা সব পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে। আলমবাগে বুলেট ছুটছে, মচ্ছিভবনে কামান। বেইলি গার্ডে তলোয়ারের ঝংকার। তীর আর তীরে চতুর্দিক অন্ধকার। বাইরে সিপাইরা আর্তনাদ করছে, তোরণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কোতোয়াল। প্রাসাদে বেগমরা কাঁদছেন, আলুথালু তাঁদের মাথার কালোচুল !....রঘুনাথ কনোয়ার বলছে—আমরা যে আজ দেশছাড়া সে-ও রামচন্দ্রেরই ইচ্ছা।

আর একটি গানের বক্তব্য : হে আমার প্রভু, আপনার অনুপস্থিতিতে গোটা রাজ্য নিঃস্তব্ধ। আপনি খুবই সুখী ছিলেন প্রভু ; এখন কী ভাবছেন আপনি ? 'ওরা আমার তৈরি কাইজার বাগকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল !' আমাদের প্রভু কলকাতা চলে গেলেন। আশায় বুক বেঁধে রইলাম আমরা। বেগমরা কেউ কেউ গাড়ি চড়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। শক্তিধর ইংরাজরা এসে দেশ নিয়ে নিল। কেউ তাদের সঙ্গে লড়াই করল না, কেউ বিদ্রোহ করল না। কেউ কেউ পালিয়ে গেল বনজঙ্গলে।

পরের গানটি নবাবের প্রিয় প্রাসাদ কাইজার বাগকে উপলক্ষ করে। ওয়াজিদ আলি নাকি আশি লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন এই প্রাসাদটি তৈরি করতে। প্রজারা সেটা জানে। তারা কেঁদে কেঁদে গাইছে—ওয়াজিদ আলি কাইজার বাগ গড়েছিলেন, হায়, তিনি তা ভোগ করতে পারলেন না ! চারদিকে সোনালি খিলান, মাঝখানে সিংহাসন। ইংরাজ ফৌজ এসে দখল করে নিল সেটি। তারাই এখন প্রভু। আহা, কী সুন্দর করেই না কাইজার বাগ গড়ে ছিলেন ওয়াজিদ আলি, কিন্তু তা তিনি ভোগ করতে পারলেন না। আমির এবং চাষী সবাই কেঁদেছিল এক সঙ্গে। সারা দুনিয়া কেঁদেছিল। বিলাপ করেছিল। হায়, নবাব তাঁর দেশকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন বিদেশে। ওয়াজিদ আলি কী সুন্দর করেই না গড়েছিলেন কাইজার বাগ, কিন্তু তা তিনি ভোগ করতে পারলেন না। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ধারণ করতেন বাদশা, তাঁর অনুচররাও গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সাজত। আমাদের বাদশা গড়েছিলেন কাইজার বাগ, কিন্তু হায়, তিনি তা ভোগ করতে পারলেন না।

এরপরের গানটি নবাবজননীকে নিয়ে। কবি বলছেন—আপনি নন্দন (লন্ডন) যাচ্ছেন, আপনি তো আর পুত্রবধূ নন ! ঈশ্বর আপনাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনুন।....তুর্কি ঘোড়সওয়াররা পরিণত হয়েছে পদাতিকে, সিপাইরা রাস্তায় রাস্তায় নালিশ করে ফিরছে। হাতি ঘোড়া সব বিক্রি হয়ে গেছে, উট নিলামে তোলা হয়েছে। লন্ডন যাচ্ছেন, (তা) আপনি তো আর পুত্রবধূ নন ! কেমন দেশ সেই দেশ ? কাকে দিয়ে আমি চিঠি পাঠাব ? খবর পাঠাব কাকে দিয়ে ? আমি কি কাক দিয়ে চিঠি পাঠাব ?

খবর পাঠাব পাখি দিয়ে ? লণ্ডন যাচ্ছেন আপনি, আপনি তো আর পুত্রবধূ নন ! ইত্যাদি ।

প্রজারা প্রথমে বিমর্ষ । ক্রমে ক্রুদ্ধ । নবাবের প্রতি ইংরাজের ব্যবহার দেখে ক্ষোভ পরক্ষণেই পরিণত হল ক্রোধে । নবাব লক্ষ্ণৌ ছাড়ার পর বছর ঘুরে আসতে না আসতেই গোটা আউধ যেন বারুদের স্তূপ । মিরাট । দিল্লি । লক্ষ্ণৌ । মে মাসেই (১৮৫৭) লক্ষ্ণৌয় আগ্নেয় বিস্ফোরণ । দেখতে দেখতে আগুন রাজ্যময় । লরেন্সের স্বীকারোক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে । জুন মাসে লেখা সেই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন—বিদ্রোহীরা কখন আমাদের ঘিরে ফেলবে এখন আমরা তারই অপেক্ষায় । লক্ষ্ণৌর ইংরাজরা তখন রেসিডেন্সির চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী ।

সাতান্নর মহাবিদ্রোহের কার্যকারণ নিয়ে অনেক আলোচনা গবেষণা হয়েছে । বিদ্রোহ, বলতে গেলে প্রায় গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল একমাত্র এই অযোধ্যায় । সন্দেহ নেই ইংরাজের বিরুদ্ধে এই ব্যাপক এবং প্রায়-সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের পিছনে অনেক কারণ ছিল । ছিল নানা স্বার্থের সংঘাত । যাঁরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত কিছু না কিছু ক্ষোভ, কোনও না কোনও অভিযোগ । কিন্তু এ কথাও বোধহয় অস্বীকার করা যায় না এই বিদ্রোহের অন্যতম উপলক্ষ ছিলেন ওয়াজিদ আলির সিংহাসনচ্যুতি । তিনি নিজে অবশ্য বিদ্রোহের পরোক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করতেও সম্মত হননি । সোজাসুজি বলেছেন, গদরের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই । কিন্তু প্রজারা যে অন্যরকম ভাবত, সাতান্নর মহাবিদ্রোহে অযোধ্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল সেটা ।

অস্ত্রধারী বিদ্রোহীরা যখন কোনও নায়ক খুঁজছেন, কেড়ে-নেওয়া আউধের সিংহাসনে বসতে পারেন এমন কোনও আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, তখন শত্রুমিত্র সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করে অন্তঃপুরের পর্দা ছুড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে আসেন ওয়াজিদ আলির এক বেগম । তিনি ইতিহাসের স্মরণীয় নায়িকা স্বনামধন্য বেগম হজরত মহল । হাতের কাছে ওয়াজিদ আলি শাহ নেই । তাঁর পুত্রকে চাই । ওরা বেগমকে ধরলেন । বেগম সম্মত ।

বেগম হজরত মহল প্রথম জীবনে নাকি ছিলেন একজন সামান্য নর্তকী । রূপ গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ওয়াজিদ আলি তাঁকে তুলে এনেছিলেন নিজের 'পরি মহলে' । হজরত মহল তখন—মাহক পরি । 'পরি' থেকে ক্রমে নবাবের শয্যাসঙ্গিনী—'বেগম' । পুত্রের জন্মের পর আরও এক ধাপ উঁচুতে উঠলেন তিনি । 'বেগম' থেকে মহল । আরও কোনও কোনও বেগমের মতো বেগম হজরত মহলও ওয়াজিদ আলি শাহের সঙ্গে কলকাতায় আসেননি । কিংবা আসতে পারেননি । পুত্র বিরজিসকে নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে

থেকে গিয়েছিলেন। হয়তো নবাবেরই প্রতীক্ষায়। তাঁর সম্পর্কে অবশ্য একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায় নবাব নাকি তাঁকে প্রাসাদ ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। কারণ, তাঁর ঘাড়ে চুলের নীচে অশুভ সর্পচিহ্ন ছিল। নবাব তাঁর মায়ের এক পরিচারিকার প্রেমে পড়ে যান। নবাবজননী কিছুতেই মেয়েটিকে হাতছাড়া করতে রাজি নন। পুত্রকে নিবৃত্তি করার জন্য বললেন—এ মেয়েকে গ্রহণ করলে অমঙ্গল হবে, তার ঘাড়ে সর্পচিহ্ন রয়েছে। কৌতুহলী নবাব মেয়েটির চুল সরিয়ে দেখলেন—তাই তো, মায়ের কথাই ঠিক ! নবাবের হারেমের সব বেগমদের ডাক পড়ল। একে একে সবাইকে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল অন্তত আটজন বেগমের ঘাড়ে রয়েছে এই অমঙ্গলের চিহ্ন। শহরের বিজ্ঞ মোল্লা মৌলভিদের ডাকা হল। তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে পাঁতি দিলেন—এঁদের তালাক দেওয়াই সঙ্গত। পরামর্শটা ওয়াজিদ আলির মনঃপূত হল না। তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের ডাকলেন। কে না জানেন, এসব ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি বিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য ! পণ্ডিতজিরা মাথা চুলকে বললেন—এই চিহ্ন যে অশুভ সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। তবে শাস্ত্র অনুসারে এর প্রতিবিধান সম্ভব। আর কিছু নয়, লোহা গরম করে সাপের মুখখানা পুড়িয়ে দিতে পারলেই বিপদ কেটে যাবে। দু'জন বেগম তাতেই সম্মত। বাকি ছয়জন আপত্তি জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ থেকে। তাঁদের অন্যতম নাকি এই বেগম হজরত মহল। এই কাহিনীর উৎস এলু জান। সে বলেছিল নবাব-জননীর গুপ্ত রত্নভাণ্ডারও নাকি দখল করেছিলেন এই বেগম। ওয়াজিদ আলি কিন্তু তাঁর স্মৃতিকথায় বেগমের মর্যাদাই দিয়েছেন হজরত মহলকে। ফোর্ট উইলিয়ামে বসে তিনি লিখেছেন—আর এক বেগম হজরত মহল। তিনিই এখন রানি। বিদ্রোহীদের নেত্রী। আর বাদশা আমার পুত্র বিরজিস।

কেউ কেউ বলেন বেগম হজরত মহলকে ঝড়ের কেন্দ্রে টেনে এনেছিল প্রাসাদের ভূতপূর্ব দারোগা মাম্মুখানের ভালবাসা। হজরত মহলের সঙ্গে নাকি গোপন প্রণয় ছিল তাঁর। এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেন না, সকলেই জানেন এবং একবাক্যে স্বীকার করেন এককালের এক সামান্য নর্তকী, ওয়াজিদ আলি শাহের অনেক সঙ্গিনীর একজন এই সুন্দরী মহাবিদ্রোহের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। আউধের আগুনে পুড়ে তিনি পরিণত এক উজ্জ্বল স্বর্ণ প্রতিমায়।

বিদ্রোহীরা তাঁর পুত্র বিরজিস কদ্রকে আউধের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেন ১৮৫৭ সনের ৬ আগস্ট। এবার আর ইংরাজের অনুমোদনের অপেক্ষা নয়, স্বীকৃতি দিলেন সত্যকারের 'নবাব' পদবি যাঁরা দেওয়ার অধিকারী তাঁরাই। অর্থাৎ, দিল্লির বাদশা। তাঁর প্রতিনিধি হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। উমরাও জান তার স্মৃতিকথায় বলছে

কাশ্মীরি নর্তকীরা নাকি সেদিন আসরে গেয়েছেন সুন্দর একটি গান—তুমি চাঁদের ঈর্ষা, হে বিরজিস কদ্র ! দুর্লভ মুক্তোর মতো তোমার রূপ,—হে বিরজিস কদ্র ! উমরাও জান নিজেও নাকি একটি গান বেঁধেছিল সেদিন—হাজার হৃদয়কে মুগ্ধ করবে আপনার বিজয়ী ভঙ্গিটি, শুভার্থীদের প্রার্থনা সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবে আপনাকে ! নাবালক পুত্রের হয়ে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বেগম হজরত মহল। তিনি রাজমাতা।

বেগমের বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতা দেখে শ্রদ্ধায় শক্ররও মাথা নুয়ে এসেছিল সেদিন। প্রজারা তাঁকে বলতেন—জনাব-ই-আলিয়া। তিনি তাঁদের কাছে—'মালকা-ই-আউধ'। আউধের লোকগীতিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—বিরজিস কদ্র আর রানি কী বীরত্বই না দেখালেন ! দুনিয়ায় চিরকালের মতো রয়ে গেল রানির নাম। সবাই জানেন, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। অবশিষ্ট ভারতের মতোই আউধেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল ইংরাজ। কিন্তু বেগম হজরত মহল ছিলেন অপরাজিত। শক্রব্যূহ ভেদ করে, তাদের বেষ্টনপ্রাচীরকে ছিন্নভিন্ন করে পুত্রকে নিয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে সাড়া মেলেনি তাঁর। কোনও প্রলোভন টলাতে পারেনি তাঁকে। ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণার জবাব দিয়েছিলেন তিনি আর এক ঐতিহাসিক দলিল রচনা করে। ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তব্যের প্রতিটি অনুচ্ছেদের উত্তরে বেগম হজরত মহলের সে কী তীব্র তীক্ষ্ণ সওয়াল ! কাগজে কলমে ভিক্টোরিয়াকে মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন তিনি। ওয়াজিদ আলির মতো তাঁর এই বেগমও জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। বেগম দেহরক্ষা করেন কাঠমাণ্ডুতে, ১৮৭৯ সনে। ওয়াজিদ আলি তার নয় বছর পরে। মনে মনে তিনিও কি গর্ব অনুভব করতেন না তাঁর এককালের প্রিয় এই 'পরি'টির জন্য ? রাসেল লিখেছেন—'দিস বেগম এক্সিবিটস গ্রেট এনার্জি অ্যান্ড এবিলিটি। শি হ্যাজ এক্সাইটেড অল আউধ....।' মেটিয়াবুরুজেরও হয়তো সেদিন এই বেগমকে নিয়ে চাপা অহংকার।

সাতান্নর বিদ্রোহে আরও অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখা গেছে ওয়াজিদ আলির হারেমের আশেপাশে। অনেক সুখের পায়রা সেদিন হিংস্র বাজপক্ষীতে পরিণত। শক্রপক্ষের একজন, গর্ডন আলেকজান্ডার লিখেছেন—সিকেন্দর বাগে বনবেড়ালের মতো লড়াই করেছেন হারেমের কয়টি মেয়ে। শেষ পর্যন্ত, অবশ্য তাঁরা মারা যান। তখনই বোঝা গিয়েছিল তাঁরা পুরুষ নন,—নারী। ফরবেস মিচেল লিখেছেন এই সিকেন্দর বাগেই একটা পিপুল গাছের ডালে বসে বন্দুক চালিয়ে একের পর এক ইংরাজ সৈন্যকে খতম করেছিলেন একটি মেয়ে। তিনি গুলিতেই প্রাণ হারান। রাসেল

লিখেছেন লক্ষ্ণৌর পতনের কয়েকদিন পরে দেখা গেল গোমতীর ওপারে লোহার ব্রিজটির কাছে পড়ে আছে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধার দেহ। তাঁর শিথিল হাতে লম্বা একটা তুলোর পলতে। কাছেই পড়ে আছে একটা বাঁশ। সেই বাঁশের প্রান্তে রয়েছে একটি বিশাল 'মাইন।' বুঝতে অসুবিধা নেই, বৃদ্ধা 'মাইন' দিয়ে ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন!

প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের এইসব দুঃসাহসিক ঘটনা উল্লেখ করে মহাবিদ্রোহের অন্যতম ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রশ্ন তুলেছেন—এই বৃদ্ধার জীর্ণ দুর্বল হাত কোন অবিচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল কোনও দিন জানা যাবে না। কোন বিষাদে বিষিয়ে উঠেছিল তাঁর হৃদয় ইতিহাস তা কোনও দিনই খোঁজ পাবে না।

কে জানে, হয়তো হারেমের ওই সব মেয়ের মতো এই বৃদ্ধাও সেদিন তাঁর প্রিয় নবাবের জন্যই বিদ্রোহিণী।

নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা

Ali, Mrs. Meer Hassan, Observation on the Mussulmans of India, London, 1917

Andrews, W. E., Major Genral Claude Martin, Lucknow, 1942

Bailey, T. Graham, History of Urdu Literature, Calcutta, 1932

Baird, G. A. (Ed.), The Private Letters of the Marquis of Dalhousie, London. 1911

Basu, P., Oudh and the East India Company, 1785—1801. Lucknow, 1943

Bhatnagar, G. D., Oudh under Wajid Ali Shah, Benares, 1968

Bose, A. C., Hazarat Wajid Ali Shah, King of Oudh, Lucknow, 1962

Brown, C. J., 'The Coins of the King of Awadh', Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol-III, No-6, 1912

Crooke, William, 'Songs about the King of Awadh', Indian Antiquary, Vol-40, Feb, 1911

Dunbar, Janet, Golden Interlude : The Edens in India, 1836—42, London, 1955

Eden, Emily, Up the Country, (NE), London, 1930

Edwards, Michael, The Orchid House, London, 1955

Fisher, Michael H., A Clash of Cultures : Awadh the British and the Mughals, New Delhi, 1987

Germon, Maria, Journal of the Siege of Lucknow, Ed. by Michael Edwards, London, 1958

Hay, Sidney, Historic Lucknow, Lucknow, 1939

Hibbert, Christopher, The Great Mutiny, India 1857, London, 1978

Hill, S. C., The life of Claude Martin, Calcutta, 1901

Hilton, E. H., The Tourist Guide to Lucknow, 1913

Irwin, H. C., The Garden of India or Chapters in Oudh History and Affairs, London, 1880

Khan, Masih-ud-din, Oude : Its Princes and Government Vindicated, Ed. by S. Ahmad, Meerut, 1963

Knighton, William, The Private Life of an Eastern King, Kondon, 1921

Kothari, Sunil, Kathak : Indian Classical Dance, New Delhi, 1989

Lewin, Malcolm, Has Oudh been worse Governed ? London, 1857

Llewellyn-Jones, Rosie, A Fatal Friendship : The Nawabs, the British and the City of Lucknow, Calcutta, 1985

Lucas, Samuel, Dacoitee in Excelsis, or the Spoliation of Oudh by the East India Company, (NE), Lucknow, 1971

Metcalf, Thomas, R, Land, Landlords, and the British Raj, Calcutta, 1979

Neville, H. R., Lucknow Gazetteer, 1904

Pemble, John, The Raj, The Indian Mutiny and the Kingdom of Oudh, 1801—1859, Calcutta, 1979.

Rousa, Mirza Mohamad Hadi, Umrao Jan Ada, Tr. by Khushwant Sing and M. A. Husáini, Calcutta, 1961.
Shah, Wajid Ali, Sorrows of Akhtar, Tr, by Abdul Wali, Calcutta, 1926
Siddiqui, M. K. A., Muslims of Calcutta, 1974
Souvenir to Commemorate Inauguration of the first nationalist Board of Trustees the Sibtainabad Emambara Trust, Calcutta, 1974
Sen, S. N., Eighteen Fifty-Seven, New Delhi, 1957
Sharma, R. C., 'Avadh School of Painting—Fresh Light on its existence, Bulletin of Lucknow Museums and Archaeology in UP, No. 32, 1983
Sleeman, Sir William, A Journey through the Kingdom of Oude, 2 Vols., London, 1858.

ঘোষ, বিনয়—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৪
মিত্র, রাজ্যেশ্বর—মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা, কলকাতা, ১৯৮৫
মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার—অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্, কলকাতা, ১৯৮৪
লাহিড়ী, দুর্গাদাস—বাঙ্গালীর গান, কলকাতা, ১৯০৫
'শরর্', আবদুল হলিম—পুরনো লখনউ, অনুবাদ—মুনীরা খাতুন ও গুরুদাস ভট্টাচার্য, নয়াদিল্লি, ১৯৭৪
সেন, চণ্ডীচরণ—অযোধ্যার বেগম, নতুন সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২